প্রকাশের প্রতীক্ষায় গ্রন্থকারের
অন্যান্য পুস্তক

দ্বিচক্রে আফগ্যানিস্থান (যন্ত্রস্থ)

অন্ধকারের আফ্রিকা

বর্ণবিদ্বেষী বুয়র

ইরাণের আর্য

~~ভয়ংকর আফ্রিকা~~

প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি

জুজুৎসু জাপান

হলিউডের আত্মকথা

আরবের কর্মপ্রেরণা

বীর বলকান

দ্বিচক্রে ইউরোপ

দ্বিচক্রে শ্যাম

দ্বিচক্রে ইন্দোচীন

Tarun Sangha
Udaynarainpore
Howrah
Est- 1944
The 1st January

প্রক

দ্বিচ

অন্ধব

বর্ণবি

ইরাণে

তমক

প্রশা

জুজু

হনি

আর

বীর

দ্বিচ

দ্বিচ

দ্বিচ

দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ

মরণবিজয়ী চীন প্রণেতা
ভূ-পর্যটক
শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পর্যটন প্রকাশনা ভবন
১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৪২

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

[illegible]নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

আমার কথা

কোরিয়ার অতীত ইতিহাস গৌরবময়। কিন্তু প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীর লোভের যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি এই কোরিয়াই। ইণ্টারন্যাশন্যাল হেগ কোর্টে জনৈক কোরিয়ান রাজকুমার ধন্না দিয়েও কোরিয়ার দুর্ভাগ্য ঘোচাতে পারেননি। সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে কোরিয়া কবে ত্রাণ পাবে জানিনে, কিন্তু পরিত্রাণের নিমিত্ত কোরিয়ায় যে চেষ্টা হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

"মজুর-কৃষক পরিচালিত ডিকটেটরিয়েল সভা" এই প্রচেষ্টার নায়ক। কোরিয়ার স্বাধীনতাকামীরা যে পথ অবলম্বন করেছেন, পুঁজিপতিদের পক্ষে তা নিতান্তই প্রতিকূল। সুখের বিষয়, কোরিয়ার প্রগতি ও স্বাধীনতাপন্থীরা প্রাচ্যদেশসুলভ মন্থর গতি পরিত্যাগ ক'রে, যন্ত্রসজ্জিত বেগবান ইউরোপের কার্যপদ্ধতির অনুসরণ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। এদের জয়যাত্রা সফল হ'ক এই কামনাই করি। এই জয়যাত্রাকে সফল করবার জন্যে জীবন-পণ করেছেন যে সব তরুণ কোরিয়ান, এই গ্রন্থখানি তাঁদেরই উদ্দেশে নিবেদন করলাম।

কোরিয়া সম্বন্ধে আমার ভ্রমণ-জনিত অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ ঐ প্রবন্ধগুলোরই মার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণ। ঐ প্রবন্ধগুলোর সংস্কার যিনি করেছেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন

বন্ধু আভিধানিক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ। তাঁর করস্পর্শেই বইখানি সাধারণের নিকট প্রকাশযোগ্য হয়েছে। তাঁকে মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর নিঃস্বার্থ শ্রমকে হেয় করতে আমি ইচ্ছুক নই। পরন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্মচারীবৃন্দ এই বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে যেরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন তার জন্য তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা না জানিয়েও পারলাম না।

গ্রন্থকার—

দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ

শিউলের পথে

নদী, নালা, পাহাড়, পর্বত এইসব নিয়েই এক একটা দেশ হয়, কিন্তু কোরিয়াতে গিয়ে এসবের দিকে বড় একটা নজর করিনি। লোকসংখ্যা কত তাও জানবার ফুরসৎ হয়নি। পর্যটকদের গাইড বইখানাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। অতএব ওসব সংবাদ জানতে হলে ভূগোলের শরণাপন্ন হওয়াই ভাল। তবে এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, কোরিয়ার উত্তরে রাশিয়া। আমাদের দেশের উত্তরেও রাশিয়ার একটা অংশ পড়েছে বটে গিলগিটের কাছে, কিন্তু কোরিয়ার উত্তরের রাশিয়া সেরকম নয়। এই পথে সহজে রাশিয়ায় যাওয়া যায় এবং সেজন্য জাপানীরা তত পরোয়া করে না। যাও, দেখে এস রুশের মুল্লুক, কিন্তু কথা ব'লো না, এই হ'ল জাপানীদের মত।

সিঙ্গোরি নদীর পুলটা পার হ'তেই বাধা পেলাম কাস্টম অফিসারের কাছে। তিনি আর কিছু দেখতে চাইলেন না, শুধু সিগারেটের কৌটো দেখেই সন্তুষ্ট হলেন। দুটা সিগারেট ছিল, তা ফেলে দিয়ে তাঁর কেস থেকে অন্য দুটো বের ক'রে দিলেন। লোকটি বেশ মার্কিনী ইংরেজী বলতে পারেন, সেইজন্যই কথা বলতে কষ্ট হয়নি। সিগারেট দুটি কেন বদলালেন জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, "যে দুটো সিগারেট ফেলে দিয়েছি তা জাপানের তৈরী, কিন্তু আপনার জানা উচিত মাঞ্চুরিয়ার লোক বিদেশী সিগারেট বিশেষ ক'রে ইউরোপিয়ান সস্তা সিগারেট

খেতে অভ্যস্ত, তাই আমরাও সেখানে সস্তা সিগারেট পাঠাই। তা ব'লে আপনাকে কোরিয়াতে এইসব সস্তা সিগারেট খাইয়ে আপনার কাশি হ'তে দেব না। কোরিয়া জাপানেরই অঙ্গ, এখানে বাজে জিনিস ব্যবহার ক'রে রোগ টেনে আনবার কারও অধিকার নেই। যদি কোরিয়ানরা অসুস্থ হয় তবে জাপানকেও সেজন্য ভুগতে হবে।" কথাটা শুনে একটু চিন্তিত হলাম। যেখানে শাসিতের প্রতি শাসকের এরূপ মনোভাব সেখানে লোকেরা নিশ্চয়ই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু তখনই মনে হ'ল জাপান কোবিয়াকে জয় তো করেছেই এখন চায় এক-দম গ্রাস করতে। যাকে গ্রাস করা হবে যদি তাতে বিষ থাকে তবে নিজেকেও যে মরতে হয়।

চিন্তাধারা বদলে গেল। চেয়ে দেখলাম সামনের পথটার আশ-পাশে উলুখড় গজিয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গে এই জাতীয় খড দিয়ে অনেকের ঘর ছাওয়া হয়। দেখে মনে হ'ল, বুঝি পূর্ববঙ্গেরই কোনও গ্রামের মাঝ দিয়ে চলেছি। মনে মনে ভাবতে লাগলাম আজ কোনও গ্রামে গিয়ে এসব খুঁটিনাটি বিষয় না দেখে কোথাও গিয়ে রাত্রিটা কাটাব মাত্র।

এদিকে যে পথ হারিয়েছি আমার সে খেয়াল নেই। ক্রমাগত চলেছি, দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, অথচ পথের পাশে একটাও নেই। অবশেষে দুপুরবেলা কাছেই একটা গ্রাম পাওয়া গেল। সেখানে পুলিশ স্টেশন থেকে লোক এসে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমি সোজা কথায় বললাম, "আমি ভারতের তরফ থেকে শক্তি দেখাতে আসিনি, আমি দেখতে এসেছি মানুষ মানুষের উপর কত রকমে অত্যাচার ক'রে সুখী হয়।" একজন সেপাই বললে, "বলুন তো এখানে যতগুলি পুলিশ আছে তাদের মাঝে কোন্‌টি জাপানী, আর কোন্‌টি কোরিয়ান?"

একজন লোক চেয়ারে বসেছিলেন দেখে মনে হ'ল জাপানীই হবেন, নতুবা গম্ভীর হয়ে চেয়ারে ব'সে আছেন কেন? তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, "ইনিই জাপানী, আব সবাই কোরিয়ান।" সবাই হেসে উঠল, আমি যাকে জাপানী ব'লে দেখিয়েছিলাম তাকে দেখিয়ে বললে, "ইনি কোরিয়ান, আর এই বাকী দুজন জাপানী।" দেখে কিন্তু মনে হ'ল না যে এদের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিতে বেশী প্রভেদ আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "এদের মাইনে কত ক'রে?" বললে, "দুজন জাপানী পায় পঁয়তাল্লিশ ইয়েন ক'রে, তিনজন কোরিয়ান পায় চল্লিশ ইয়েন ক'রে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "এই প্রভেদের কারণ কি?" জাপানী পুলিশ এসে বুক ঠুকে বললে, "আমাদের দেশ নাগাসাকি, অতএব এখানকার ঘরভাড়া কে দেবে? এই যে কোরিয়ানদের দেখছেন, এরা যখন আমাদের দেশে গিয়ে কাজ করে তখন এরাও ঘরভাড়া বাবদ কিছু নেয়। এরা যদি ঘরভাড়া না নিত তবে আমরাও নিতাম না।"

ভাববার বিষয় বটে। 'তারা যদি না নিত তবে আমরাও নিতাম না'—এর মানে কোরিয়ান পুলিশও জাপানে সমান বেতনে চাকরি করে। পরে আরও শুনলাম, কোরিয়ান সেপাই আর জাপানী সেপাইয়ের বেতনে কোনও পার্থক্য নেই। নৌবিভাগেও একই কথা। সর্বত্র সমভাব ভালই। কিন্তু এসব ক্ষমতা জাতীয় বৈশিষ্ট্য যারা হারিয়েছে তাদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। জাতীয় ভাবাপন্ন কোরিয়ানদের কোন সরকারী কাজে এখনও নেওয়া হয় না। পুলিশের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার গন্তব্য শিউল, এখন বলুন তো কোন্ পথ ধরি?" সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে। একজন বললে, "আপনি চলছেন সিঙ্গোরি নদীর মোহানায়, শিউলে নয়। তবে আজ রাতটা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে থাকুন, কাল ঠিক

পথ পাবেন।" ওরা আমাকে কিছু খাবার খেতে দিয়েছিল। এদের মনের প্রফুল্লতা দেখে মনে হ'ল না যে এরা কোনও খারাপ কাজ করতে পারে। এদের দ্বারা একটা পথের নক্‌সা আঁকিয়ে নিলাম। তাতে ছিল—এত মাইল গিয়ে দেখবেন একটা ছোট পথ এই পথটাকে কেটেছে, সোজা চলবেন, তার পর বাঁদিকে এই পথ থেকে একটা পথ বেরিয়েছে, তাতে যাবেন না, ইত্যাদি এদের পথ-নির্দেশ দেখে মনে হ'ল এরা মানুষের উপকার করতে খুব উন্মুখ।

বেশী দূর যেতে হ'ল না। ঘণ্টা দুই চলার পরই একটা পুলিশ স্টেশন। সেখানে আমার জন্য পুলিশ অপেক্ষা করছিল। আমি পৌঁছতেই একজন পুলিশ বেরিয়ে এসে আমাকে স্টেশনে নিয়ে গেল। বিশুদ্ধ মার্কিনী ভাষায় বললে, "ফোনে সংবাদ পেয়েছি আপনি এদিকে আসছেন। এখন বলুন কোন্ জাতীয় হোটেলে নিয়ে যেতে হবে—চীনা, জাপানী, না কোরিয়ান। চীনা হোটেলের ভাড়া দুই ইয়েন, জাপানীর এক এবং কোরিয়ান হোটেলের ভাড়া এক ইয়েন দশ সেণ্ট।" বললাম, "কোরিয়ায় এসেছি, কোরিয়ান হোটেলেই থাকতে চাই, তাতে কোরিয়ান রীতিনীতির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।" একথা বলতে সে আমাকে একটা হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলটি যেন একটা বাড়ি। পুলিশসহ যেতেই হোটেলের মালিক আমাকে তাঁদের কায়দায় মাথা নত ক'রে অভিবাদন করলেন। আমিও দস্তুরমত আমাদের কায়দায় তাঁকে প্রতিনমস্কার করলাম। এর পরই পুলিশ ও কোরিয়ান হোটেলওয়ালাতে কি সব বচসা হ'তে লাগল। আধ ঘণ্টা কথা হবার পর হোটেলওয়ালা রেগে হন্‌হন্ ক'রে গিয়ে একটা বই নিয়ে এল। এনে পুলিশকে দেখালে। বইটা পুলিশ ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেশ খানিকক্ষণ বচসা হবার পর হোটেলওয়ালা আমাকে তার সবচেয়ে ভাল ঘরে স্থান দিলে।

ঘরে চেয়ার টেবিল কিছুই নেই, সমস্ত মেঝেটা মাদুর পাতা। ঘরের মাঝখানে তোষক, চাদর ও বালিশ ছিল, তা পেতে দিয়ে গরম জল এনে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়ান জুতা এনে দিলে পায়ে দিতে। কোরিয়ান জুতোয় আর চীনা জুতোয় কোনও প্রভেদ নেই। আমার হাতমুখ ধোয়া হয়ে গেলে বাইরে এসে দেখি, পুলিশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বললে, "আমাদের বেশ বচসা হয়েছে আপনাকে নিয়ে, বিকেলে এসে বলব। এখন আমাকে কাজে যেতে হবে। আমি জাপানী, কোরিয়ান পুলিশ বেশ ভাল মার্কিনী বলতে পারে, সে-ই এসে সব বলবে।" বলেই সে বিদায় নিলে।

বিকালে ব'সে ব'সে কোরিয়ান ভাষার বিষয় চিন্তা করছিলাম। চীনা এবং জাপানী ভাষার মতন এ ভাষার লেখন দুরূহ নয়। অনেকটা গুরুমুখী ধরণের, একটু চেষ্টা ক'রলেই লিখতে পারা যায়। চীনা ভাষায় উচ্চারণ প্রায়ই Ts পূর্ববঙ্গের "ছ"এর উচ্চারণের মত দিয়ে সুরু হয়। কিন্তু কোরিয়ান শব্দে সেরূপ কিছু নেই, বেশ সরল।

এমন সময় একজন কোরিয়ান পুলিশ এসে আমাকে পল্টনী কায়দায় সেলাম করলেন। আরম্ভ করলেন সকালের সেই ঝগড়ার ব্যাখ্যা। হোটেলওয়ালা এবং জাপানী সেপাইয়ের সঙ্গে বিবাদ বেধেছিল আমার জাত আর বয়স নিয়ে। হোটেলওয়ালা বলেছিল আমার বয়স সাঁইত্রিশ হ'তেই পারে না, যদি তাই হয় তবে আমার দেশ নিশ্চয়ই মালয়, ঠিক ভারতবর্ষ নয়। হোটেলওয়ালা তার প্রমাণ দেখিয়েছিল পর্যটক মিশনারীদের বই থেকে। তাতে লেখা আছে, ভারতবাসী মাত্র চল্লিশ বছর বাঁচে, এবং মরবার পূর্বে অন্তত তিনটে বিধবা রেখে যায় তার শোকে কাঁদবার জন্য। আমার বিজ্ঞপ্তিপত্রে ছিল, আমি মালয় থেকে ভ্রমণ সুরু করেছি। তাতেই এই ঝগড়ার সূত্রপাত। জাপানী সেপাই

আমার পাসপোর্ট দেখে তর্ক চালিয়েছিল যে, আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ এবং আমি ভারতবাসী। তাতে হোটেলওয়ালা বলেছিল হ'তে পারে আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ, কিন্তু প্রতিপালিত হয়েছি নিশ্চয় মালয় দেশে, সেইজন্যই ভারতীয় দোষ আমাতে বর্তায়নি। জাপানী শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে না পেরে কোরিয়ান সেপাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তার মীমাংসা করতে। কিন্তু যে ভাবে জাপানী সেপাইয়ের সঙ্গে কোরিয়ান হোটেলওয়ালা ঝগড়া করল তাতে আমার মনে হয়েছিল, পুলিশ নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছে, নতুবা মাথা নত ক'রে সেলাম ঠুকবে কেন? যাই হ'ক আমি কোনও উচ্চবাচ্য না ক'রে পুলিশটিকে বললাম, "চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।"

দুজনে মিলে একটা তরমুজের দোকানে গেলাম। গিয়েই পায়ের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়বার ভাণ ক'রে বললাম, "আমি একটা কুড়ুল চাই, শীগগির আসুন।" তৎক্ষণাৎ পুলিশ একখানা কুড়ুল আনতে বললে। কুড়ুল আনা হ'লে বললাম, "একখানা দা চাই, পায়ের ব্যথা আর সহ্য করতে পারছি না।" যখন দুটি জিনিষই পেলাম তখন বললাম, "আমার ব্যথা চ'লে গেছে।" সবাইকার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললাম, "আমার পায়ে একরকম ব্যথা হয়, দা-কুড়ুল একত্রে না দেখলে দূর হয় না। আরও বিশেষ ক'রে দূর হয়, যদি একটি জাপানী পুলিশ সামনে থাকে। লোকটি বোকার মত আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, "ও একরকমের তুক।"

তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে পুলিশ স্টেশনে গেলাম এবং জাপানী সেপাইটিকে ডেকে নিয়ে হোটেলে এলাম। হোটেলওয়ালাকে বললাম বইটা আনতে। সে নিয়ে এলে দাম কত জিজ্ঞাসা করলাম, বললে, ছয় সেন্ট। বইটা হাতে নিয়ে বললাম, "কোরিয়ান সেপাইকে যা বলব

তার একবিন্দুও ভুল না ক'রে কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ ক'রে যান।" তার পর বলতে লাগলাম, "আমি শুনেছি কোরিয়ায় কোরিয়ানরা দা-কুড়ুল সন্ধ্যার পর তাদেব বাড়িতে রাখতে পারে না, কিন্তু আপনারই সামনে পুলিশ স্টেশনে ঘুরে এলাম, কেউ দা-কুড়ুল নিয়ে পুলিশ স্টেশনে জমা দিতে এল না তো। অথচ সন্ধ্যা তো হয়েছেই, এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। দা-কুড়ুল প্রত্যেকের বাড়িতেই আছে, একটু আগেই তা আমি পায়ে ব্যথার ভাণ ক'রে জেনে এসেছি। অথচ এই মিশনারীরা প্রচার করছে, কোরিয়ানরা তাদের বাড়িতে দা-কুড়ুল রাখতে পারে না। ঠিক তেমনি, এই বড় বইটাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তার প্রায় সবই মিথ্যা প্রচার।" কথা শুনে হোটেলওয়ালার মুখ কালো হয়ে গেল, পুলিশ দুজন হাসতে লাগল। জাপানী সেপাইটি তৎক্ষণাৎ আমাকে একখানা পত্র লিখে দিলে, সেই পত্রের বলে কোরিয়ায় যত মিশনারী স্কুল আছে তার প্রত্যেকটিতে বক্তৃতা দেবার অধিকার পেলাম। জাপানীরা আমেরিকান মিশনারীদের মোটেই পছন্দ করে না, কারণ এরাই কোরিয়ায় কোরিয়ানদের জাতীয় ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

পরদিন প্রাতে বেরিয়ে যাব ব'লে সাইকেলটা ঠিক করেছি, এমন সময় একটি কোরিয়ান যুবক এসে বললে, সে আমাকে পিংইয়াং-এর পথ দেখিয়ে দেবে, এবং এক দিন সে আমার সঙ্গে থাকবে। তাকে পুলিশের লোক বলেই মনে হ'ল, কিন্তু যখন সে চলতে চলতে কমিউনিস্ট বক্তৃতা আরম্ভ করল তখন তার সম্বন্ধে যে কি ধারণা করব তা ঠিক করতে পারলাম না। বলতে লাগল, "আমাদের শক্তি নেই, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি কিছু নেই, তবুও উন্মত্ত বাসনার সৃষ্টি হয় মনের কোণে, আমরা মানুষ, আমাদের বাঁচবার অধিকার আছে মানুষের মত, আমাদের

বাঁচতে হ'লে রুটির দরকার, জলের দরকার, দরকার যত কিছুর সবই আমাদের পেতে হবে, কিন্তু বাধা দিচ্ছে ধনিকের দল, টাকার মারফতে তারা বোকাদেব বিদ্রোহী ক'বে তোলে তাদের আপন ভাইদের বিরুদ্ধে। দোহাই দেয় জাতীয়তা, সম্প্রদায় এবং ধর্মের। আমাদের যদি বাঁচতে হয়, তবে এইসব দোহাইকে পঙ্গু করতে হবে, পৃথিবী হ'তে মুছে ফেলতে হবে, এই হ'ল মানবতার প্রথম সূত্র", ইত্যাদি।

ছেলেটির যৌবন সবে দেখা দিয়েছে। লেখাপড়া করছে মিশনারী স্কুলে। ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা জানে, বইতে পড়েছে। ছেলেটি আমেরিকান প্রবেশিকা পাশ কবেছে, বেশ ইংরেজী বলতে পারে। সে ভগবান সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। প্রত্যেক কথার পরই বলতে লাগল, "ভগবান আছেন, থাকবেন, কিন্তু অবতারগুলিই যত অনর্থের মূল। তারা হয়ত ভাল করতেই চেয়েছিল, কিন্তু তাদের চেলারা হয়েছে এখন সাম্রাজ্যবাদীদের এক-এক মহান অস্ত্র। লোকে সহজেই তাদের কথায় মেতে ওঠে।" জিজ্ঞাসা করলাম, কটা ধর্ম আছে তাদের দেশে। সে বললে, "বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং অহংব্রহ্মবাদ। অহংব্রহ্মবাদীদের সংখ্যা খুব কম। খ্রীষ্টানরা বেশ দল বাড়াচ্ছে, কিন্তু তাদেরই দৌলতে আজ আমরা লেখাপড়া শিখেছি, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারখানা কি। সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল খ্রীষ্টধর্মের নেশায় আমাদের মাতাল ক'রে রাখতে, কিন্তু জানে না যে আমাদের দেশের উত্তরে রাশিয়া-সূর্য সদাসর্বদা আমাদের দেশে আলো বিকীর্ণ করছে। আপনাদের দেশের উত্তরে হিমালয়ের অভ্রভেদী প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রাচীর ভেদ ক'রে রাশিয়ার সূর্যের আলো আপনাদের দেশে পৌঁছতে পারে না।" সাইকেল চালাবার বেলা আমি সিগারেটও টানি না, কথাও বলি না, অতএব আমার শুনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না।

পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "সঙ্গের ছেলেটা কষ্ট দিচ্ছে না তো?" আমি বললাম, "কষ্ট কিসের? আমি তো আর কথা বলছি না, ওর যা খুশী বলুক না কেন।" পুলিশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। আমাকে বললে, "এই দেখুন আমেরিকানদের কাজ, সুন্দর সিং নামে এক ব্যক্তির নাম ভাঁড়িয়ে খাচ্ছে। যীশুর নামে আর চলে না, এখন বুদ্ধদেবের দেশের একটা লোক খাড়া করেছে। বলছে, "যে দেশে বুদ্ধ এসেছিলেন, সে দেশে নাকি প্রথম নম্বরের যীশুর চেলার জন্ম হয়েছিল, সে সুন্দর সিং। এ ছেলেটা বুঝি জানতে চায় যে সাধু সুন্দর সিং কত হাত লম্বা ছিল, কত চওড়া ছিল, তার গ্রাম কোথায় ছিল?" এক গ্লাস জল খেয়ে নিলাম, কথার জবাব দিলাম না। যুবক যা বলেছে, যদি ব'লে দিতাম তবে তার অন্তত চৌদ্দ বৎসরের জেল হয়ে যেত।

কতদূর গিয়ে একটা পাহাড় পড়ল। পাহাড়ের গায়ে সবেমাত্র গাছ গজাতে আরম্ভ করেছে। যুবককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, যখন কোরিয়া চীনের মিত্ররাজ্য ছিল, তখন কোরিয়ানরা গাছ কেটে ফেলে দিয়ে সবগুলি পাহাড়কে চীনের মত করেছিল। জাপানীরা আসার পর বৃক্ষের জন্ম হয়েছে এবং দেশের কিছুটা প্রাকৃতিক অভাব মিটেছে। সাইকেলে চড়বার আগে বললাম, "তবে জাপানী আসাতে অন্তত একটা লাভ হয়েছে বটে।" যুবক লাফিয়ে উঠে আমাকে বললে, "জাপানী আসাতে আমাদের অনেক লাভ হয়েছে, সত্য কথা, কিন্তু জাপানীরা তো কোরিয়ান নয়, একথা আপনি স্বীকার করবেনই, যে পরাধীন সে সোনার সিংহাসনে ব'সে থাকলেও পরের অধীন, স্বাধীন নয়" ইত্যাদি। যুবক লজ্জিত হয়েছে ব'লে মনে হ'ল। বললে, "তাড়াতাড়ি চলুন, বেলা হয়েছে অনেক। আরও তিনটে পুলিশ স্টেশন পাড়ি দিতে হবে, তবে শহর। তারপর প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে আপনার গমনের সংবাদ

যাচ্ছে, আপনাকে ওরা ডেকে নেবে, কিন্তু আমাদের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেতে হলে—পুলিশের আদেশ নিতে হয়। কোরিয়ার যে সকল যুবক-যুবতী এখনও জাপানী হয়ে ওঠেনি তাদের জন্যই শুধু এই ব্যবস্থা। Denationalised করবার এটাও একটা উপায়। আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে নীরবে চললাম।

কোরিয়াতে একটা প্রবাদ আছে যে, জাপানী কেরানী, কোরিয়ান মজুর এবং চীনাদের বুদ্ধি একীভূত হ'লে পৃথিবী জয় হয়। তাই দেখতে লাগলাম কোরিয়ানদের পরিশ্রমের বাহাদুরি। প্রাতে এসেছে মাঠে কোদাল নিয়ে, এখনও ফিরে যাবার নামটি নেই—এত অভিনিবেশের সঙ্গে কাজ করছে তারা। ঘৃণা তাদের মোটেই নেই,—মানুষের মলমূত্র ব্যবহার করছে সাররূপে মাঠে। তাও আবার বিনা পয়সায় পাবার যো নেই, কিনতে হয়। মাঠের পাশে রুমাল মুখে দিয়ে দেখছি। যুবক বললে, ঐ কৃষক এই মাঠের অধিকারী নয়, ধনীরা কলে কৌশলে, ধর্ম আর আইন দেখিয়ে কৃষকদের পরিশ্রমের সবই গ্রাস করছে। যদি কৃষক তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না। কিন্তু মজার কথা এই যে, কৃষককে বলুন তো, দশ জনে মিলে একটা জমি তৈরী ক'রে তার ফসল ভাগ ক'রে নিতে। তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন ওঠাবে, দশ জন মানে প্রত্যেক পরিবার হতে দুজন ক'রে আসবে কি না। এই সামান্য হিংসার বশবর্তী হয়ে কৃষক তাদের যথাসর্বস্ব হারায়। আমাদের দেশে অনেক সাদা রাশিয়ান কৃষক পালিয়ে এসেছে। তারা সমবায় মাঠে কাজ করতে রাজী নয়, তারা বলে, যার বাড়িতে তিনজন কাজ করছে সে যেমন ভাগীদার হয়, যার বাড়ি থেকে একজন আসছে সেও তেমনি ভাগীদার হয়, এটা সহ্য হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, রুটি, সব্‌জি, চা, চিনি পরিবারের লোকসংখ্যা অনুসারে

বণ্টন করা হয়। শস্যও একেবারে যে সমান ভাগ হয় তা নয়, লোকসংখ্যা হিসাবে। একটা কৃষকের চারটে ছেলে, এখনও বিদেশে স্কুলে পড়ছে , অন্য কৃষকের তিনটি ছেলে স্কুল শেষ করেছে, তারা কাজে যায়। পুরণো ধরণের লোকের তা সহ্য হয় না। তারা বলে, আমরা কাজ করব আর সবাই খাবে তা হবে না। সেজন্য এখনও অনেক বৃদ্ধ পালিয়ে আসে আমাদের দেশে। আমাদের দেশের কৃষকদেরও চোখ ফুটছে না, ফোটাবার চেষ্টা চলছে মাত্র।"

আমি উঠলাম, যুবকও উঠল, তার পর শহরের দিকে চললাম।

২

আমরা গ্রাম্য পথে চলেছি। কোরিয়াতে বড বড পথ আছে। গ্রামগুলি একটির পর একটি আসতে লাগল। এ যে আমাদেরই মত অনেকটা। দোচালা, চারচালা সব খড়ের ঘর। তবে লোকগুলো আমাদের মত নয়, রং আলাদা, মুখের গঠন আলাদা। তাদের দেশের বর্তমান অবস্থা অনেকটা আমাদের সঙ্গে মেলে। তবে সে মিলের স্বরূপ বোঝাবাব ভাষা আমার নেই। যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ আমরা কোন্ শহরে যাব ?" যুবক বললে, "সেন-সেন"। সঙ্গে সঙ্গে বললে, কোরিয়ায় গ্রাম, শহর, নদ, নদী, পাহাড, পর্বত ইত্যাদির যত কোরিয়ান নাম ছিল, তা পরিবর্তন ক'রে তাদের জাপানী নাম দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয়রা বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা কোরিয়ান নামই ব্যবহার করেন, কিন্তু জাপানীদের দ্বারা সম্পাদিত কোনও মানচিত্রে আর কোরিয়ান নাম নেই। জাতির অস্তিত্ব লোপ

করবার অসৎ প্রবৃত্তির এটি হ'ল এক বিশেষ উদাহরণ। ইতিপূর্বে কোরিয়াতে ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ভাষার এবং নামের পরিবর্তন হয়নি। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, কনফিউসিয়ান প্রভৃতি একাধিক ধর্মাবলম্বী এসেছে, কিন্তু মানুষের নাম, গ্রামের নাম, পাহাড, পর্বতের নাম বদলায়নি। জাতির বৈশিষ্ট্য বেঁচে ছিল। কিন্তু জাপানীরা তা চায় না ব'লেই কোরিয়া এখন আর কোরিয়া নেই, জাপানীদের হাতে প'ড়ে 'চোজেন' হয়ে গেছে।

একটি গ্রামে গিয়ে বসলাম। তিনটি মাত্র পরিবার। গ্রামের চারিদিকে ফুল-ফলের বাগান, দূরে ধানের ক্ষেত। ঘাগরা-পরা মেয়েগুলি আপন আপন কাজে ব্যস্ত। মেয়েদের পরণে যত বস্ত্র সবই শুভ্র। পুরুষদের পোষাকও চীনাদের মতই, তবে সাদা সূতোর কাপড়ে তৈরী। আমরা বসেছিলাম কামারের দোকানে। আমাদের আগমনে কামারের কাজে বাধা পড়ল। একটি বৃদ্ধ ও একটি যুবক মিলে কাজ করছিল। আমাদের কর্মকারেরা যে ভাবে কাজ করে কোরিয়ানরা সে ভাবে কাজ করে না। তারা বেন্চ বসিয়ে দেয় কাজের জন্য, যন্ত্রপাতির সাহায্য নেয় প্রচুর। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক ছুরি তৈরী হচ্ছিল। বোধ হয় এসব ছুরি ভাবতে বিক্রয়ার্থ আসে। যুবক এবং বৃদ্ধ আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এল ভাত, শূকরমাংস ও সব্জি। কোরিয়ান যুবক আমার মুখ দেখেই আমাকে চিনতে পেরেছিল। "তংওয়া এলব" তাদের সংবাদপত্রে আমার ছবি ছেপে দিয়েছিল। আমার নাম এবং বয়স বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে শেষটায় কর্মকার-যুবক জানতে চাইলে আমার নামটা' মুসলমান আমলের না তার পূর্বের। আমি বললাম, অর্ধেকটা পূর্বের এবং অর্ধেকটা পরের। যুবক আমার নাম আবার লিখলে। রামনাথ একদিকে, অন্যদিকে বিশ্বাস। সঙ্গের

যুবককে বললে আমাকে বুঝিয়ে দিতে যে, পরেরটুকু অর্থাৎ বিশ্বাস শব্দটা আমার পূর্বপুরুষের নেওয়া উচিত হয়নি, বরং খারাপ ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে জ্ঞানের ধর্ম নেওয়া চলে, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হ'লে পুরণো প্রথায় এবং নিজের ভাষায় নাম রাখা দরকার। সঙ্গের যুবক আমাকে বুঝিয়ে দিলে, যদি বিজেতার নাম এবং ভাষা গ্রহণ করা হয় তবে জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লোপ পায়, সে দাসে পরিণত হয়। যার নিজস্ব সত্তা নেই তার মানবজন্ম বৃথা। কথাটা কর্মকারের মুখে শুনে আমার আনন্দ হ'ল। বুঝতে বাকি রইল না, জাপানীদের হাতে তাদের দেশের পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী প্রভৃতির নাম পরিবর্তন ঘটাছে, এ তারই প্রতিক্রিয়া।

বিকালেই আমরা সেন-সেন পৌছলাম। পথে বৃষ্টি হয়েছিল ব'লে কষ্ট হ'ল খুব। কারও বাড়িতে গিয়ে উঠলাম না, উঠলাম একটি ছোট কোরিয়ান হোটেলে। একটি ছোট ঘর, মেঝেতে মাদুর পাতা। হোটেলের চাকর তার উপর তোষক এবং চাদর বিছিয়ে দিলে। স্নানের ব্যবস্থাটা বাইরেই। স্নান ক'রে আসার পরই চীনা ধরণে সবুজ চা খেতে দিলে। তার পর এল খাবার। চীনা ও কোরিয়ান খাবারে বিশেষ পার্থক্য নেই। খেয়ে গিয়ে আরাম করতে বসলাম। পুলিশের লোক এল। কথা হ'ল অনেক। তার মর্ম হ'ল, যদি মিশনারীদের বিরুদ্ধে মিশনারী-পরিচালিত স্কুলে বক্তৃতা দিই তবে পুলিশ তাতে আপত্তি করবে না। বক্তৃতায় কি যে বলব তাই ভাবতে লাগলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, ভারতের যা কিছু ভাল তা-ই বলব, অন্য কিছু নয়।

সেন-সেন একটা ছোট শহর। সেখানে এক দিন থেকে পরদিন কয়েকজন যুবকের সঙ্গে একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রামে গেলাম। পুরুষরা মাঠে কাজ করছে। শুনলাম এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে আজ পর্যন্ত

কোনও ধর্মই পৌছয়নি, তাদের ধর্ম হ'ল 'অহং ব্রহ্মোঽস্মি'। যারা এই ধর্ম মেনে চলে তারা প্রায়ই ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাদের তীর চালানোও অন্য গ্রামে গিয়ে দেখেছিলাম।

যুবকের দল আমাকে পেয়ে মত্ত হয়ে গেল। দিন তো কাটাতে হবে, একটা অবলম্বন চাই। নূতন কিছু পেলেই এরূপ মত্ততা আসে, আনন্দ আসে। কিন্তু আমি তাদের কি দেব? ভারতের বিরুদ্ধে যেসব প্রচার হয় তার কথা উত্থাপন করলাম। একজন বললে, "অনেক শুনেছি ভারতের বিরুদ্ধে, পড়িও, কিন্তু হাসি। যা ভাল, তাই গ্রহণ করি, বাদ-বাকি ছেড়ে দিই। যদি এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হয় তবে আমাদের কাছে নয়, যান মিশনারীদের কাছে যারা যীশুর নামে দল পাকায়। আমরা এসবে নেই, আমরা আপনার কাছ থেকে আনন্দ চাই। আমরা মরা, আমাদের ভিতর চাঞ্চল্য এসেছে আপনাকে পেয়ে।" একটি লোক হিন্দী বলতে লাগল। সে ছিল সাংহাই শহরে, শিখদের চালচলন দেখাতে লাগল। পাগড়ি বাঁধল, তারপর বললে, "নিকাল যাও।" শিখদের সম্বন্ধে এর বেশী জ্ঞান বোধ হয় তার আর নেই। তার পর ফোটো তোলা হ'ল, খাওয়া হ'ল, এবং পরে গাছের ছায়ায় বসে কথা হ'তে লাগল। কথার শেষে আমি বললাম, "ধন্য আমরা যে মিশনারীদের অনুগ্রহে ইংরেজী শিখে আজ একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারছি।" কিন্তু বাধা পড়ল। "কুকুর বিড়ালরাই এমন ক'রে কৃতার্থ হয়। আজ যদি আমরা মানুষ হতাম তবে ভারতের পর্যটককে এমন স্থানে এনে গোপনে কথা বলতে হ'ত না, আমরা দোভাষী এনে ভারতীয় পর্যটকের কথা শুনতাম।" আর কিছু বললাম না, কারণ মিশনারীদের বিরুদ্ধে তাদের মেজাজ এতই গরম মনে হ'ল যে তাতে শীতল জল সিঞ্চনে বিপরীত ফলেরই বেশী সম্ভাবনা ছিল।

বিকালে শহরের লোক যখন কাজকর্ম ক'রে বেড়াতে আরম্ভ করেছে, তখন একজন জাপানী অফিসার কতকগুলি ছেলেকে নিয়ে পথের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাদের মধ্য থেকে বেছে এক দিকে কোরিয়ান ছেলেদের দাঁড করালেন, অন্য দিকে জাপানী ছেলেদের দাঁড করালেন। ছেলেদের কারও বয়স দশের বেশী ব'লে মনে হ'ল না। কোরিয়ান ও জাপানী দল থেকে দুটি সমান ওজনের ছেলে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে লডাই লাগানো হ'ল। কোরিয়ান ছেলেটি জাপানী ছেলেটিকে কাবু ক'রে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসল। অনেকক্ষণ ধরে জাপানী ছেলেটি ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তার পর উক্ত জাপানী অফিসার জয়ী কোরিয়ান ছেলেটিকে দুটি পেন্‌সিল দিলেন। আবার দুটি ছেলে লডল। এবারও কোরিয়ান ছেলের জয়। তৃতীয়বার একটি জাপানী ছেলে জিতল। সে পেল একটি মাত্র পেন্‌সিল। এই পুরস্কার-বৈষম্যের কারণ জানতে চেয়ে শুনলাম, যাতে জাতীয় ভাবহীন কোরিয়ান ছেলেরা তাডাতাডি জাপানীদের মত দেহ এবং মনে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে সেইজন্যই এরূপ পক্ষপাতী উৎসাহ দানের ব্যবস্থা। জাতীয় ভাবাপন্ন ছেলেদের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা নেই।

পরদিন প্রাতে আবার আমার যাত্রা সুরু হ'ল। সঙ্গে এবারে অন্য একজন যুবক। এই যুবক সবেমাত্র জেল থেকে বার হয়েছেন। যেসব কারণে জেলে গিয়েছিলেন তার প্রথমটি হল জাপানীদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করা, দ্বিতীয় কারণ হল জাপানে জাপানীরা যাতে ধনিকদের গোলাম না হয়ে যায় তার জন্য বক্তৃতা করা। ইনি জেলে একা ছিলেন না, অনেক কোরিয়ান এবং জাপানী যুবকও ছিল। জাপানী যুবকদের মাঞ্চুরিয়া পাঠানো হয়েছে, কোরিয়ানও অনেক

গেছে, কিন্তু ইনি যাননি। বুঝতে পারলাম জাপান এবং কোরিয়ায় যুবকদেরও অনেকেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদে সুখী নয়। এখনও আমার কাছে এই যুবকের ফোটো আছে। দেখলেই মনে হয়, জেলে তাকে কষ্টে কাটাতে হয়েছে, শরীর ও স্বাস্থ্য তার নষ্ট, তবুও যে আমার সঙ্গে চলেছেন তার কারণ বিশাল ভারতের সংবাদ সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ। সংবাদপত্র তাঁদের সুখী করতে পারে না, ভারতীয় প্রেস তাঁদের সংবাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না ব'লেই তিনি আমাব সঙ্গ নিয়েছেন। বেশী দূর একটানা তিনি যেতে পারলেন না, সামান্য দূর গিয়েই বিশ্রাম নিতে ব'সে পডলেন। আজ আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আমার গন্তব্য স্থান সিন-এন-সু। শুনেছি সেখানে স্কুল আছে তাই এত লম্বা পাডি দিতে হচ্ছে। পথে মাইল-স্টোন নেই যে বলতে পাবব কত মাইল এসেছি। পথও আবার উঁচু-নীচু। উত্তর কোরিয়াকে পাহাডে দেশ বললে দোষ হয় না। কিন্তু এই পাহাডে ভূমিতেই সোনা ফলেছে। যে দিকে চেয়েছি সে দিকেই বন-উপবনে ভর্ত্তি। এসব উপবন নূতন করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে যুবক উঠলেন, আমরা আবার চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দুই-একখানা চীনা দোকানী সওদা বিক্রী করছে। যুবক বললেন, চীনা মুদীর দোকানে কোরিয়ানরা সবাই আসে, যদিও বর্তমানে এদের সঙ্গে বেশ লডাই চলছে। লডাই মানে যেমন আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমানের লডাই। আমাদের দেশেরই মত স্বার্থবাদী তৃতীয় পক্ষ দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কতকগুলি অজ্ঞান কোরিয়ান যুবক এই কাণ্ড ঘটায়। ওরা বলে, চীনা ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করতে পারবে না, তাদের যেতে হবে তাদের দেশে। টাইডেন, শিউল এবং হেজোতে তারা অনেক চীনা দোকান লুটপাট করেছিল, অনেক

চীনাকে প্রাণেও মেরেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াতে পারেনি, শিক্ষিত যুবকেরা অচিরেই বুঝেছিল কাদের স্বার্থে তারা যন্ত্রের মত এই অপকর্মে প্ররোচিত হয়েছে। সঙ্গের যুবক দুঃখিত হয়ে বললেন, "মানুষও এক ধরণের পশু, তাদের মগ্ন পশুত্ব তাই অনেক সময় জেগে ওঠে। সে পশুভাবকে দমিত রাখবার জন্যই রাষ্ট্রের দরকার। যে রাষ্ট্র সংকীর্ণ স্বার্থ সাধনের জন্য এই পশুভাবকে প্রশ্রয় দেয় তাকে রাষ্ট্র বলা চলে না। তাকে কি যে বলা চলে সে সংজ্ঞা এখনও ঠিক হয়নি।" যে সব চীনা দোকানী পথে পড়তে লাগল তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, তাদের প্রতি অত্যাচার হয়নি বটে, কিন্তু হবার জোগাড় হয়েছিল। একটা দোকান পড়ল একেবারে পুলিশ স্টেশনের সামনেই। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কেমন আছে, অত্যাচার হয়নি তো? সে স্পষ্ট ক'রে বললে "এসব সরকারেরই কাজ। যদি সরকারের রক্ষা করবার ইচ্ছা না থাকে তবে সরকারের ঘরের মাঝে থাকলেও বাঁচাবার উপায় নেই।" কথাটা বলেছিল পুলিশের সামনেই। পুলিশের লোক চীনা ভাষা বোঝেনি বলেই রক্ষা। সিন-এন-সু শহরে আমরা রাত্রে পৌঁছই এবং একটি জাপানী হোটেলে আশ্রয় নিই। হোটেলের মালিক বড়ই সদাশয়। আমার কাছ থেকে অর্ধেকের কম পয়সা নিয়ে থাকতে দিলেন।

তাঁকেই সর্বপ্রথম বললাম, চীনাদের তাড়িয়ে দেওয়া বরং ভাল, কিন্তু এমন ক'রে লুটপাট করানো ভালো নয়। তিনি নিয়ে এলেন একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে। ইনি 'ওসাকা মায়নিচি শিম্বুন' পত্রের রিপোর্টার। আমার মত ও মন্তব্য অবিকল তিনি নিজেদের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। পিছনে জুড়ে দিয়েছিলেন, জগতের শান্তির জন্য চীন-জাপানের মিত্রতা অত্যাবশ্যক।

এখানে জগতের শান্তি মানে নিজের ষোল আনা বজায় রাখা, আর কিছু নয়। জাপান চীনকে গ্রাস করুক কিংবা জাপানের কোনও মিত্র রাষ্ট্র চীনের সর্বনাশ করুক, তাতে চীন বাধা দিতে পারবে না। জাপানের মতে তার নাম শান্তি আর চীন-জাপানে মিত্রতা। কিন্তু জাপানেও আজ এমন লোক হয়েছে যারা চায় না চীনকে অধীন করতে। তারা চায় চীন স্বাধীন হোক, আপন শক্তি ফিরে পা'ক।

প্রাতে একটা স্কুলে বক্তৃতা করি। সেটি হ'ল ছেলেদের স্কুল। বিকালে মেয়েদের স্কুলে যাই এবং ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে বলি। ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের কাছে যেরকম মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ভারতীয় মেয়েদের লজ্জা নেই, অনেকে নাকি কাপড়ও পরে না, পথে ঘাটে খালি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। কি করে যে এই মিথ্যার প্রতিবাদ করব তা বুঝতে পারছিলাম না। যা হোক, আমার কথা শুনে অনেক যুবতীই সুখী হয়েছিলেন। তাদের ইচ্ছা ছিল আমি আর একদিন আবার তাদের কাছে ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আমি আনাড়ী ব'লে তা আর বলা হয়নি।

রাত্রি চারটের সময় উঠেই সিংইয়ার নামক স্থানের দিকে চললাম। গাছের পাতাগুলি কুয়াশায় ভিজে গিয়েছিল। পথে আমি একা। তবে যেভাবে বন্ধুরা ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন, তাতে আমার আর ভুল হয়নি। পথ যদিও খারাপ তথাপি মাঝে মাঝে সঙ্গী পেতে লাগলাম। বেলা বারটার সময় একজন সঙ্গী মিলল। সে বেশী দূর যাবে না বটে, তবে ইঙ্গিতে তার বাড়িতে যেতে বলল। পথের পাশেই তার বাড়ি। ভাবছিলাম কিছু খেতে দেবে, কিন্তু দিলে না।

শেষটায় নিজেই একটি জাপানী কথা বললাম 'কমে', মানে চাল। আমি মনে করছিলাম 'কমে' মানে ভাত। যুবক তৎক্ষণাৎ আমাকে কতকগুলি চাল এনে দিলে। চাল চিবিয়ে খাওয়া যায় না। ইঙ্গিতে বললাম পিষে দেবার জন্য। চালগুলি ঘরে নিয়ে গিয়ে পিষে দিলে। আমি গুঁড়ো চালে চিনি এবং জল মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। চেষ্টা করেছিলাম ভাত পাবার জন্য, কিন্তু ভাত তাদের ঘরে ছিল না। লোকটির বাড়ি থেকে চালের গুঁড়ো খেয়েই বিদায় নিতে হয়েছিল।

দিনটা বড়ই গরম মনে হচ্ছিল। আকাশ মেঘাবৃত ছিল ব'লেই এত গরম। কিছু দূরে গিয়ে ক্ষেতে মূলোর মত একরকম জিনিষ দেখলাম। কাছে গিয়ে ঘ্রাণ নিলাম, বুঝলাম তা মূলো নয়। একজন জাপানী কৃষক একখানা কাগজ আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কি লিখলে, তার পর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিলে, বুঝতে চেষ্টা কর। সে বলেছিল, "হেজ পুলিসি।" অর্থাৎ হেজ-এ গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞাসা কর এটা কি। পিংইয়াং-এর জাপানী নাম হেজ। পিংইয়াং গিয়ে পুলিশকে আর জিজ্ঞাসা করতে হয়নি। বুঝতে পারলাম এই মূলোজাতীয় শিকড়ই আমি সাণ্টাং প্রদেশে খুঁজেছিলাম। সেদিনই একটি কিনে তা গুঁড়ো ক'রে দুধের সঙ্গে খাই, এবং শরীরে বেশ শক্তি পাই। এই ঔষধের কেনা-বেচার উপর জাপানের একচেটিয়া অধিকার। কেউ যে বেশী কিনে বিদেশে চালান দিতে পারবে, তার অধিকার নেই। এই মূলোজাতীয় শিকড় বিক্রী ক'রে জাপান চীন হ'তে প্রচুর অর্থ পায়। একে সিদ্ধ ক'রে শুকিয়ে বিদেশে চালান দেওয়া হয় ব'লে এর থেকে বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যায় না। জিনিষটা তাজা খেতে পারলেই উপকার হয়।

৩

পিং ইয়াং

আমাদের দেশে যেমন শিলং, সিমলা, দার্জিলিং, কোরিয়াতে পিংইয়াংও সেইরূপ। শুধু তাই নয়, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফিলিপাইনের বাঘিও, জার্মানির ড্রেসডেন, ভারতের শ্রীনগর, মালয়ের ফ্রেজার হিল-এর মত। এজন্য অনেক বড় বড় অফিসার সেখানে থাকেন। শহরে প্রবেশের পথেই পুলিশের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদেরই মারফতে হোটেল ঠিক করলাম। কোরিয়ান হোটেল। ওষুধটি খাওয়ায় রাত্রে খুব ঘুম হ'ল।

পরদিন প্রাতে শহরটি বেড়াতে বার হব, এমন সময় এক থিয়েটার পার্টির লোক আমাকে রাত্রে তাঁদের থিয়েটার দেখতে যেতে বললেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। তাঁদের অনেকে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতে গিয়ে যদি কোরিয়ান থিয়েটার দেখান যায়, তবে লোকে দেখবে কি না। তাঁদের থিয়েটার দেখে তবে মতামত প্রকাশ করব বললাম। আমার সঙ্গী অনেক জুটলেন। বাজারের ভিতর প্রবেশ করতেই একটি লোক টেনে আমাকে বসাল। বসবার পরই কতকগুলি ফল এনে দিলে খেতে। ইউরোপে যেসব ফল হয়, কোরিয়াতেও তাই। লোকটি নিজে কথা বলতে পারেনি আমার সঙ্গে, কিন্তু লোকের মারফতে অনেক কথা জেনে নিলে।

শহর ছেড়ে আমরা চললাম গ্রামে। গ্রাম দেখলাম। প্রত্যেক পুরুষের মাথায় লম্বা চুল। দেখতে এক-একটি সাধুর মত। শরীর সুঠাম, মুখ হাসিমাখা। দেখলেই মনে হয় এরা পাপ কাজ জানে না। গ্রাম দেখে আবার শহরে ফিরলাম।

যেসব যুবক আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির সামনে গিয়ে একটা ফোটো তুললেন। তার পর অনেকগুলি তোরণ-দ্বার দেখালেন যেখানে এখনও গুলির দাগ আছে। জাপানীদের লড়াইয়ের সময় এসব ভেঙ্গে গিয়েছিল। যুদ্ধের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ জাপানীরা এসব রেখে দিয়েছে। এসব দেখা হ'লে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। কতকগুলি যুবক আমার সঙ্গে কথা বলতে এল। তাদের মধ্যে কোরিয়ান এবং জাপানী দুই-ই ছিল। তাঁরা আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করলেন যা আমি আজ পর্যন্ত কারও মুখে শুনিনি। "ভগবান বুদ্ধ যে মত প্রচার ক'রে গেছেন, তাতে জগতে শান্তি আসবে, না লেনিন যে পথ তৈরী করেছেন সে পথে জগতে শান্তি আসবে?" কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। ভগবান বুদ্ধ জগতের দুঃখদৈন্য দেখে অস্থির হয়েছিলেন, রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, যোগ অভ্যাস করেছিলেন। তাব ফল যা হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত এখনও দেখা যায়। তার পর মহাত্মা গান্ধী যে মতবাদ প্রচার করেছেন তাও কিছু কিছু বুঝি। কিন্তু লেনিন যা করেছেন তা দেখবার আমার সুযোগ ঘটেনি। অতএব সে সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই।

যুবকেরা আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গুপ্ত পুলিশের লোক এসে বললে, "আর কিছুক্ষণ পরেই থিয়েটার সুরু হবে, তৈরী হ'ন, খেয়ে নিন, আপনাকে নিয়ে যাবার ভার আমারই উপর পড়েছে।" প্রকাশ্যেই তিনি বললেন তিনি একজন গুপ্ত পুলিশের লোক। যাঁরা আমার কাছে বসেছিলেন তাঁরা হাসলেন। আমি খেয়ে তাঁরই সঙ্গে থিয়েটার দেখতে চললাম।

যেমন আমাদের দেশের থিয়েটার-বাড়ি হয়, কোরিয়াতেও তেমনি।

থিয়েটার স্থরু হবার পূর্বে কিংবা পরে রাজভক্তি প্রকাশের কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। আমাকে বিশেষ 'সিট'-এ বসানো হ'ল, চা ও সিগারেট বিনা পয়সায় দেওয়া হ'ল। গোয়েন্দা পুলিশটি আমারই কাছে চুপ ক'রে ব'সেছিলেন। মাঝে একবার বিরামও হয়েছিল। সে সময় গোয়েন্দা আমাকে কোনও প্রশ্ন করেননি, থিয়েটার যখন শেষ হ'ল তখন আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন কিছু বুঝতে পেরেছি কি না। আমি যা বুঝেছিলাম তা নীচে লিখলাম।

এক যুবক এবং যুবতীতে ভালবাসা হয়। যখন তাদের পরিচয় হয় তখন যুবক বলেছিল তার পিতা জজ, যুবতী বলেছিল তার পিতা সংবাদপত্রের সম্পাদক। বিবাহকালে যুবতীর পিতা সংবাদপত্রের সম্পাদকের পোষাক প'রে আসে, যুবকের পিতাকে যুবক জজের পোষাক পরিয়ে আনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের একজন ছিল পিয়ন এবং অন্য জন ছিল সংবাদপত্রের হকার। কোবিয়া এবং জাপানে সংবাদপত্রের হকার রাত্রি চারটে থেকে সংবাদপত্র বিলি করতে থাকে। নগদ দাম নেবার ব্যবস্থা নেই, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক হিসাবে দাম আদায় করা হয়। রাত্রি চারটের সময় লোক গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে। সংবাদপত্র বিক্রেতাকে চোর ভেবে কেউ হয়ত প্রহার করতে পারে সেজন্য তারা পায়ে আমাদের দেশের নর্তকীদের মত ঘুঙুর বাঁধে এবং দরজার নীচের দিক দিয়ে সংবাদপত্রটা প্রবেশ করিয়ে দিয়েই অন্য দরজায় যায়। এক-একটি লোক এক-এক পাড়ায় সংবাদপত্র বিক্রী করে। কোরিয়া এবং জাপানের গলিগুলি সংকীর্ণ, কিন্তু বেশ লম্বা, তাই সংবাদপত্রের হকারকে অনেকক্ষণ কুঁজো হয়ে হয়ে চলতে হয়। এরূপ ভাবে অনেক দিন কাজ করায় যুবতীর পিতা হকার মহাশয় কুঁজো হয়ে পড়েন। এই কুব্জত্ব গোপন করবার জন্য

যুবতী তার পিতার পিঠের দিকে দুটো ইট বেঁধে দিয়েছিল, যাতে সে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে।

এদিকে যুবকের পিতাও জজের আফিসের বড় বড বইগুলি এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে সরাবার জন্য কুঁজো হয়ে কাজ করতে করতে কুঁজো হয়ে পড়ে। যুবকও তার পিতাকে সোজা রাখবার জন্য পিছনের দিকে দুটো ইট বেঁধে দেয়। উভয় কুঁজোর যখন বিবাহ-মন্দিরে দেখা হ'ল তখন তারা একে অন্যকে চিনে ফেললে। উভয়েই উভয়ের বাল্যবন্ধু এবং উভয়ের একই শহরে বাস। শুধু কাজের জন্যই তাদের অনেক দিন দেখাশোনা হয়নি। যুবক-যুবতীর সামনেই তারা তাদের পিঠের ইট খুলে ফেলে। যখন ওরা পিছনের বাঁধা ইটগুলি খুলে ফেলে দিলে, তখন যুবক-যুবতীর মুখ কালো হয়ে গেল। উভয় বৃদ্ধ যুবক-যুবতীকে বললে, "যেহেতু আমরা বাল্যবন্ধু এবং একে অন্যকে ভাল করেই চিনি, অতএব তোমাদের বিয়ে হ'তে বাধা নেই।" পুরণো প্রথা অনুযায়ী বিয়ে হয়ে গেল। পুরণো প্রথাটা এই যে, মেয়ের যদি ছেলে পছন্দ হয় তবেই বিয়ে হ'তে পারে। বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখন এক দেশী পাদরী এসে বললেন, "পুরণো প্রথায় বিয়ে আর বাইবেলের প্রথায় বিয়ে একই, অতএব আমিও মন্ত্র পাঠ ক'রে নিই।" যুবক-যুবতীর হাতে পাদরীর ফী দেবার মত পয়সা না থাকায় তারা পাদরীর কথায় কর্ণপাত না ক'রে একে অন্যের হাত ধ'রে চলে গেল। পাদরী সাহেব আকাশ পানে তাকিয়ে রইলেন।

আমাকে থিয়েটার দেখার সময় কোনও দোভাষী দেওয়া হয়নি, কিংবা নাটকের বিষয় সম্বন্ধে ইংরেজীতে লেখা কোনও চুম্বকপত্রও দেওয়া হয়নি। এসব ব্যতিরেকেও একটা অজানিত ভাষায় বলা গল্পের মোট কথা ব'লে দিতে পারায় অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা ধন্যবাদ

দিলেন। অনেকে আমার নির্দেশমত সুবর্ণপদকও পেয়েছিলেন। কোরিয়ান থিয়েটারে পুরুষ পুরুষের পার্ট নেয়, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের পার্ট নেয়। এসব স্ত্রী ও পুরুষ প্রায়ই বিবাহিত এবং ভদ্র, পতিতা নয়। আমারই হোটেলে থিয়েটারের একজন যুবক সস্ত্রীক উঠেছিলেন। তাঁরা ভদ্র পরিবার।

রাত্রি অনুমান তিনটের সময় হোটেলে এসে শুয়েছিলাম। তাই সকালে উঠতে দেরী হয়েছিল। গত রাত্রে ভাষা না জেনেও যে অভিনীত গল্পটি ঠিক বলতে পেরেছিলাম, সেজন্য অনেক সংবাদপত্রের রিপোর্টার কৌতূহলী হয়ে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঘুম থেকে উঠে আসতেই তাঁরা সানন্দে থিয়েটার সম্বন্ধে আমার মন্তব্য চাইলেন। তাদের অভিনয়, বিশেষত গান, আমার ভাল লেগেছিল। তাই ওসব সম্বন্ধে আমি আনাড়ী হ'য়েও বলেছিলাম, কোরিয়ান গান ও অ্যাক্‌টিং এশিয়ায় অদ্বিতীয়। এ কথা বলার দরুণ আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল জাপানে গিয়ে। জাপানে পর্যন্ত আমার মন্তব্যের প্রতিধ্বনি হয়েছিল। জাপানে ভারতীয় অনেক ভদ্রলোক আমাকে ধ'রে বলেন, পর্যটকের পক্ষে সংগীত সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করা নাকি ঠিক হয়নি। যে দেশে তানসেন জন্মায় সে দেশের গান ভাল নয়, ভাল হ'ল কি না কোরিয়ার গান।

বর্তমান বাংলা সুর এবং কোরিয়ান সুর প্রকৃতিতে একরূপ বললে কোনও দোষ হয় না। গান সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান এই যে, সুর দিয়ে মনের ভাব প্রকাশকে গান বলে। গানের প্রত্যেকটি শব্দ সু-উচ্চারিত হওয়া চাই, ভাষা প্রাঞ্জল হওয়া চাই। সুরকে সাহায্য করবার জন্য বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ যদি সুরের উপর চ'লে যায় তবে তাকে গান বলে না। বাংলা গানে যেমন শুধু মন্দিরা, শুধু

খঞ্জনী, কি শুধু একটা একতারার সাহায্যেই অনেক সময় গান সম্পন্ন হয়, কোরিয়ান গানেও তেমনি অনেক সময় দুটো কাঁসার বাটি, দুটো কাঠের টুকরো কিংবা ছোট একটা ঢোল হ'লেই কাজ চ'লে যায়। জাভা, বলি, কম্বোজ, বর্মা, আফগানিস্তান, আরব, এসব দেশের ভাষায় শব্দকাঠিন্য থাকার দরুণই তাদের গানের সঙ্গে অনেক বাদ্যযন্ত্রের দরকার হয়। বাংলা, কোরিয়ান, এসব শ্রুতিমধুর ভাষা সমন্বিত গানে বাদ্যযন্ত্রের মোটেই দরকার নেই। জয়দেব, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বোধ হয় পিয়ানো, ক্ল্যারিয়নেট প্রভৃতি নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের দরকার হয়নি।

কোরিয়ান এবং জাপানী সংবাদপত্র আমার এই মন্তব্য তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়েছিলেন। কোরিয়ার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'তংওআ এলবো' তারে জানালেন, শিউলে গিয়ে আমি যেন তাঁদের অতিথি হই। বাঙলার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে 'তংওআ এলবো'র তুলনা করা চলে কতকটা। 'কতকটা' বলার কারণ এই যে, যেখানে দুটি বাঙালী পরিবার একত্রে আছে এমন স্থানে আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার আছে কি না জানি না। কিন্তু কোরিয়ানদের ছোট ছোট গ্রামেও 'তংওআ এলবো'র রিপোর্টার আছে। যারা লিখতে পারে না তারা নিকটস্থ বড় গ্রামের রিপোর্টারকে এসে মৌখিক রিপোর্ট দিয়ে যায়। অনুসন্ধানে জানলাম মৌখিক রিপোর্টারেরা এই পরিশ্রমের পরিবর্তে রিপোর্ট পাঠাতে যে ডাক খরচা হয় তা পায় এবং দৈনিক একখানা ক'রে 'তংওআ এলবো' পায় মাত্র। এই 'তংওআ এলবো'ই কোরিয়ান জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নতুবা এই জাতি জাপানীদের মাঝে কবে তলি'য় যেত।

জাপানীরা কোরিয়ানদের নানা ভাবে গ্রাস করতে চেয়েছিল। সকল পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে এখন ভালবাসার পথ খোলা হয়েছে। পূর্বে মাঝে মাঝে বিদেশী সংবাদপত্রে এমনও শোনা যেত যে জাপানীরা

গ্রামকে গ্রাম ছেলে-বুড়ো বিচার না ক'রে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু ফল তাতে খারাপই হয়েছিল। বর্তমানে জাপানী পলিসি হ'ল সমতা প্রদর্শন দ্বারা কোরিয়ানদের হৃদয় জয় করা। বেতনের ক্ষেত্রে সমতা প্রসার অনেকটা হয়ে গেছে। তা ছাড়া, আমি স্বচক্ষে দেখেছি একটি জাপানী মহিলা একটি ছেলেকে পিঠে বেঁধে পথে বের হয়েছেন, এমন সময় একটা কোরিয়ান যুবক সাইকেল ক'রে এসে জাপানী মহিলার উপর পড়ে। ছেলেটা সাইকেল থেকে মাটিতে প'ড়ে যায়, সাইকেলটা গিয়ে পড়ে জাপানী মহিলার উপর। এতে জাপানী মহিলার খুব চোট লাগে। কিন্তু অনেকগুলি জাপানী লোক সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কোরিয়ান যুবককে তারা কিছুই বলেনি। এরূপ ঘটনা যদি সাংহাই বা পিকিংয়ে কোনও চীনার সঙ্গে হ'ত তবে নিশ্চয় একটা চীন-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়ে যেত।

সেদিন বিকালবেলা একটা বক্তৃতা করি, তাতে অনেক লোক সমাগম হয়েছিল। বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম, আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা প্রচার হয় তাতে যেন কেউ কান না দেয়। কতকগুলি যুবকও ভারতের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা দেন। এদের সঙ্গে মিশে আমার ভ্রমণ অনেকটা সার্থক হ'ল, অনেক নূতন কথা অবগত হ'তে পারলাম। যে কথা সংবাদপত্রে, ভূগোলে থাকে না। এখানেই পর্যটনের সার্থকতা। তা ছাড়া কোরিয়াতে ভারতীয় পর্যটক বড় একটা যায় না। কোরিয়াতে পর্য্যটক যায় না ব'লেই কোরিয়ার লোক পর্যটককে পেলে আদর করে, সাহায্য করে এবং নানা কথা জানতে চায়।

সিংইয়াং হ'তে বিদায়ের বেলা এক যুবক আমার সঙ্গ নিলেন। যুবক বেশ শক্তিশালী। যে গ্রামেরই কাছে আসতে লাগলাম সেই গ্রামের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার ক'রে 'ভারতীয় পর্যটকের আগমন'

ঘোষণা করতে লাগলেন। এটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও কত কি সব যে বলছিলেন তা বুঝতে পারিনি। গ্রামের লোক মনে হ'ল আমার আগমনে সুখীই হয়েছে। যারাই ইংরেজী জানত তারাই আমার বয়স এবং কটা বিয়ে করেছি জিজ্ঞাসা করত। স্ত্রীলোকেরা আবার আমাকে দেখে ভয়ও পেত। কেননা তারা শুনেছে ভারতের নারীদের ভারতের পুরুষরা পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রাখে, অত্যাচার করে নানা ভাবে, বিষ খাইয়ে মারে। ভারতের নারী নাকি পশুরই মত হয়, তারা ছেলে উৎপাদনের কল মাত্র। এরূপ ভাবেই ভারতেব নারীদের সম্বন্ধে কোরিয়ানদের কাছে প্রচার করা হয়েছে। সার্ হরিসিং গৌর আমার যাবার কয়েক দিন পূর্বেই শিউলে গিয়েছিলেন। সঙ্গে তাঁর কন্যাও ছি'লেন। তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে এসেছিলেন তা বলেননি ভারতে এসে। শিউলে গিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। সার্ হরিসিং কেন যে কোরিয়া ভ্রমণ লেখেননি তা বুঝতে পারলাম না। লিখলে ভারতের লোক বুঝত বিদেশে তাদের কত সম্মান।

সেদিন ছিল আমাদেব দীর্ঘ যাত্রা। পথিমধ্যে অনেক গ্রাম পড়েছিল। দ্বিপ্রহরে একটা জাপানী হোটেলে বিশ্রামার্থ স্থান নিলাম এবং খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি চলছে। দরজাটা খুলে দেখি ডান দিকে পুলিশ স্টেশন। একটা আঙ্গিনা, তাতে অন্তত দুই শত কোরিয়ানকে ধ'রে আনা হয়েছে। কোরিয়ানরা কেউ ব'সে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। পুলিশে পুলিশে লাঠির লড়াই চলছে, তারা তাই দেখছে। সঙ্গের কোরিয়ান যুবকটি ঘুমুচ্ছিল, তাকে জাগালাম। তার পর তাকে বললাম, যা ঘটে এবং যেসব কথা হয় সে যেন বিনা মন্তব্যে তা আমাকে বলতে থাকে।

কতক্ষণ পরে একজন উচ্চপদস্থ জাপানী অফিসার এলেন। এসে একটা টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, একজন কোরিয়ান তা কোরিয়ান ভাষায় অনুবাদ ক'রে বলতে লাগলেন। উক্ত পুলিশ অফিসারটি বলছিলেন, "হে ফেরিওয়ালাগণ, তোমরা ব্যবসা করছ, অত্যন্ত ভাল কাজ করছ। তোমাদের এই ভাল কাজে সরকারের হাত দেবার ক্ষমতা নেই। তবে কেন পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে তোমাদিগকে এখানে এনেছে? পুলিশ নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে। পুলিশ দণ্ডার্হ। বল কি দণ্ড দেওয়া যায় পুলিশকে।" একজন বললে, "পুলিশদের এক-এক দিনের মাইনে কেটে নেওয়া হ'ক, সে পয়সা দিয়ে আমাদের বিক্রেয় সওদাপত্র গস্ত করা হ'ক, আর এখানেই আমাদের ভোজের ব্যবস্থা করা হ'ক।" অফিসার বললেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আপনাদের জানা উচিত বহুদিন হ'ল আপনাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ভার কোরিয়ার সরকার হাতে নিয়েছেন। আপনারা যদি দুর্বল হয়ে পড়েন, রোগে ভোগেন, তবে কোরিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার পর নরহত্যার জন্য বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা আপনারাই আইন ক'রে করেছেন। কোরিয়া সরকার নরহত্যা পছন্দ করেন না, এবং যে সে কাজ করে তাকে প্রাণদণ্ড দেন, এটা বোধ হয় আপনাদের জানা আছে।" সকলে বলল, "অবশ্য অবশ্য।" তার পর একজন ডাক্তার এলেন। তিনি চিত্রে দেখাতে লাগলেন, একটি লোক বাজারের কাছে ব'সে তরমুজ বিক্রী করছে। তাতে মাছি বসছে, সে মাছি আসছে আঁস্তাকুড় হ'তে, কাজেই তারা তরমুজে রোগের বীজাণু বপন করছে। অনেকে সে তরমুজ খাচ্ছে। যার শরীরে বেশী শক্তি সে রোগের বীজাণুকে হজম ক'রে ফেলছে, যারা দুর্বল তারা রোগে কষ্ট পেয়ে মরছে। ডাক্তার চিৎকার ক'রে বললেন, "এই যে এতগুলি লোকের মৃত্যু হ'ল তার

কারণ কে ? এই তরমুজ-বিক্রেতা নয় কি ? সে নরহত্যাকারী নয় কি ? তাকে ফাঁসিতে চড়ানো উচিত নয় কি ? তোমরা ফেরিওয়ালারা প্রত্যেকে এই অপরাধ কর, অতএব তোমরা প্রত্যেকে নরহন্তা নও কি ? তোমাদেরও ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত নয় কি ? তোমরাই বল।" সকলে মাথা নত ক'রে রইল।

পুলিশের কর্তা হেসে হেসে বললেন, "তোমরা চেয়েছিলে পুলিশদের এক দিনের মাইনে কাটতে। আমি তোমাদের ফাঁসিতে ঝোলাব না, তবে আজ বিক্রী ক'রে যে যা পয়সা পেয়েছ তা এখানে রেখে যেতে হবে, যার কাছে যত সওদা আছে তাও রেখে যেতে হবে। তোমাদের সামনেই তা মাটির নীচে পোতা হবে। মনে রেখো ভবিষ্যতে এরূপ ভাবে যে নরহত্যার ফাঁদ পাততে বাইরে আসবে তাকেই নরহত্যার দায়ে দায়ী করা হবে।" কোরিয়ানরা একে একে পকেট খালি ক'রে রিক্ত হস্তে চ'লে যেতে লাগল। শুধু একটা বুড়ী তাতে রাজী হ'ল না। সে-দিনের ছাড়া অন্যান্য দিনেরও বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার সঙ্গে ছিল। সে বললে, "আজ যা বিক্রী করেছি তা দিয়ে যেতে পারি, আগেরগুলো নয়।" অফিসার তাতেই রাজী হলেন এবং বুড়ীকে বার বার বললেন "জানি না তুমি কত কোরিয়ানের মৃত্যুর কারণ হয়েছ। বুঝেছ তো, আর যেন এরূপ না হয়।" বুড়ী চ'লে গেল। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। পথে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরূপ কি পূর্বে হয়নি।" ভদ্রলোক বললেন, "হবে না কেন। কতবার ধরা হয়, কতবার ছাড়া হয়। কিন্তু অত সহজে চরিত্র শোধন হয় না।" এদিক দিয়ে জাপানীদের দোষ দেবার কিছু নেই।

কোরিয়ানদের প্রতি এই অমায়িক ভাব দেখাবার এক মাত্র কারণ হ'ল কোরিয়ানদের প্রগতি-আন্দোলন।

আজ যেসব গ্রাম আমাদের পথে পড়ল, দেখলাম তাদের অধিবাসীরা অনেকেই পৃথিবীর দৈনন্দিন সংবাদ রাখে। গ্রামে পৌছবার পূর্বেই অনেক লোক আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। আমাকে তাবা ভারতের কথা তো জিজ্ঞাসা করতই, আর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা কবত চীনারা জাপানীদের পরাজিত করতে পারবে কি না? কোরিয়ানরাও অনেক সময় চীনে ভ্রমণ করতে পাবে না, কারণ অনেক কোরিয়ান অর্থের লোভে চীনে গিয়ে জাপানের হয়ে পুলিশের কাজ করে। এসব কাজ যারা করে কোরিয়ানরা তাদের মোটেই পছন্দ করে না। ফলে তাদের গ্রামে বাস করা কষ্টকর হয়ে ওঠে, গ্রামবাসীরা তাদের বয়কট করে। কোরিয়ার লোক চীনাদের উপকারী বন্ধু।

৪

ফরাসীদের ইন্দোচীন, ওলন্দাজদের যাভা, সুমাত্রা, পর্তুগীজদের দমন, দিউ, গোয়া এবং ব্রিটিশের ভারত—এসব দেখেছি, এখন জাপানীদের কোরিয়া দেখলাম। যতই দেখছি মনে হচ্ছে না যে এটা জাপানীদের কোরিয়া, মনে হয় এটা জাপানী এবং কোবিয়ানদের উভয়ের বাসভূমি। জাপানী অফিসারকে দেখলে কোরিয়ান যুবক ভয় পায় না, কোরিয়ান বৃদ্ধও জাপানীদের ভক্ত নয়, এসব আপনা হতেই পর্যটকের চোখে পড়ে, কাউকে তা দেখিয়ে দিতে হয় না। কসু হ'তে সারিওয়ান এসে পড়েছি। অনেক লোক আমাকে দেখতে আসছে। কোরিয়ানরা দলে ভারী, জাপানীরা অল্প। উভয়ে মিলে

নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। একটি কোরিয়ান যুবক, সে জাপানী নৌবিভাগে কাজ করে, সে আমাকে বললে, ম'রে গেলে সে কোথায় যাবে তা আমি বলতে পারি কি না। কি জবাব দেব খুঁজে পাইনি। জাপানী পুলিশও এসেছিল, কিন্তু ওরা একে অন্যের সঙ্গে আমার সামনে যেরূপ ব্যবহার করলে, তাতে মনে হ'ল না যে জাপানীরা কোরিয়ানদের ঘৃণা করে। তবে কোরিয়ারই অন্তত্র গোলমাল হয় কেন? যারা শাসন করে তাদেরই দোষে এমন হয়, না যারা শাসিত তাদের দোষে হয়? মনে মনে ঠিক করলাম আজ বিশ্রামের পর এর মীমাংসা করব। কিন্তু হয়ে উঠল না, সঙ্গী কাজের ব্যস্ততায় চলে গেলেন, আমি একটি জাপানী হোটেলে আসতে বাধ্য হলাম। বড় সুন্দর হোটেলটি। কোরিয়ানরা দল বেঁধে হোটেলে আসতে লাগল। হোটেলের জাপানী মালিক বেশী হৈ চৈ বোধ হয় পছন্দ করেন না, তাই তিনি বোধ হয় দু-একটা ছোকরাকে চোখ রাঙিয়ে-ছিলেন। আমারই সামনে তারাও চোখ রাঙিয়ে রুখে দাঁড়াল। তারপর হোটেলের মালিকের বড় মেয়ে এসে উভয় পক্ষকে ঠাণ্ডা করল। আমাকেও ইঙ্গিতে বললে শুয়ে থাকতে। ব্যাপারটা দেখে মনে হ'ল কোরিয়ানরা জাপানীকে শাসক বলে গ্রাহ্যই করে না, উপরন্তু চোখও রাঙায়। এসব হলো অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

আমার মনে আছে, সাংহাই নগরীতে একটা বড় হোটেলের একজন শিখ দারওয়ান কতকগুলি চীনা ছোকরাকে অনর্থক গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ছোকরাগুলি শিখটিকে কুকুর ব'লে চ'লে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আমাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি কি সত্যই সেরূপ হয়ে গেছে? কোরিয়ান অফিসার মোটেই জাপানী অফিসারকে ভয় করে না, নিজের বুদ্ধিতেই কাজ চালিয়ে যায়। আমাদের দেশের মত প্রত্যেক কাজে

তারা সাহেবের সমর্থন আছে কি না এই দ্বিধায় জড়িয়ে থাকে না। বিদেশে গেলেই আপন দেশের কথা মনে হয়, সবেতেই তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।

বিকালে একজন জেলফেরত কোরিয়ান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর শরীর খুব দুর্বল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কোনও রোগ হয়েছিল কি না। তিনি বললেন তাঁর কোনও রোগ হয়নি, জেলের খাটুনিতেই তাঁর এই অবস্থা হয়েছে। জেলে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন আমেরিকা হ'তে প্রভূত অর্থ উপার্জন ক'রে যখন তিনি দেশে এলেন তখন দেশের লোকের দুর্দশা দেখে তাঁর সহ্য হয়নি। তিনি তাই পার্টিতে যোগ দেন। পার্টি ধরা পড়ে, সকলেই জেলে যায়, তিনিও গিয়েছিলেন। অনেকের শরীর ভাঙেনি, কিন্তু তাঁর ভেঙে গেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, জাপানীরা যখন তাঁদের শাসক তখন তাঁরা জাপানীদের মন জুগিয়ে চলতে বাধ্য কি না। তিনি বললেন, "এমন কথা কখনও মনেও আসেনি। নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য বিদেশী শাসকের কাছে গিয়ে হাতজোড় করার চেয়ে মৃত্যু বহুগুণে ভাল। আপনারা সেরূপ করেন নাকি?" আমার মাথায় বজ্রপাত হ'ল। কথাটা চাপা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি অভিজ্ঞ লোক, সবে জেল হ'তে বার হয়ে এসেছেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। তিনি বললেন, "চাকরিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমরা যাই না। স্কুল থেকেই ঠিক হয়ে যায় কে চাকরিতে যাবে। ভাল ছাত্রেরাই চাকরি পায়। পুলিশের কাজে তো একরকম বাধ্য হয়েই যেতে হয়। পল্টনে এবং নৌবিভাগে অনেকে সখ ক'রে ঢোকে, কিন্তু পরে যখন বার হয়ে আসতে পারে না, তখন দুঃখ করে। এই দুই বিভাগে কোরিয়ান এবং জাপানীর পোষাক-পরিচ্ছদে মাইনের হিসাবে কোনও পার্থক্য নেই। 'মাঝে মাঝে লড়াইও হয়,

জাপানীরাই তাল সামলায়। তাল সামলাতে এরা বড়ই ওস্তাদ। কোরিয়ানদের এরা এমন ক'রে আপন ক'রে নেয় যে, ভুলিয়ে দেয় তারা কোরিয়ান।" সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখালেন, "ঐ দেখুন কোরিয়ান হয়ে জাপানী পোষাক প'রে ব'সে আছে। ওর মাঝে কি কোরিয়ার কিছু আছে? যে কোরিয়ান হয়ে জাপানী পোষাক পরে সে কি মানুষ? এমন ক'রেই জাপানীরা কোরিয়ানদের মনুষ্যত্ব হরণ করে।"

এসব দেখে আমার মন চঞ্চল হয়েছিল। সামান্য মালয়, সেও তার অফিসারকে পরোয়া না ক'রে সামনেই সিগারেট টানে, পান চিবায়। কর্মান্তে আফিসের বাইরে যদি অফিসারের সঙ্গে দেখা হয় তবে সাধারণ ভদ্রলোকেরই মত ব্যবহার করে, চরণে লুটিয়ে পড়ে না। আর আমরা চাকরি পেলাম কি ব্যক্তিত্ব হারালাম। কি ক'রে পূজা করব, ডালি দেব, এই চিন্তাতেই বিভোর। আমি ব'সে ব'সে সেই সবই ভাবতে লাগলাম। কোরিয়ার কথা একদম ভুলে গেলাম।

বিকাল বেলা জাপানী হোটেলওয়ালা বড়ই ভদ্রতা দেখালেন। আপন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন, তার পর কি বলতে চাইলেন, কিন্তু জাপানীদের কেউ ইংরেজী বলতে পারে না, তাই আমাকে তাঁর বাড়ির চারিপাশ ঘুরিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে যেখানে মশা-মাছি জন্মাবার সম্ভাবনা সেখানেই লবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লোনা জলে মশা-মাছির ডিম নষ্ট হয়, এমন কি যা ফুটে গেছে তাও ম'রে যায়। কোরিয়ানদের বাড়ির দিকে দেখিয়ে বললেন, কোরিয়ানরা তা করে না। বুঝলাম কোরিয়ানরা অনেক সময় বাজে খরচ ক'রে অর্থ নষ্ট করে, ইচ্ছা করলে জাপানীদের মত তারাও লবণ ছড়িয়ে মশা-মাছির উপদ্রব কমাতে পারত। কিন্তু কেন তা করে না তাও দেখতে হবে। 'তবে কি জাপানীদের চেয়ে কোরিয়ানরা

গরীব ? না, তারা গরীব নয়, জাপানীদের যেমন আয় কোরিয়ানদেরও সেই রকমই আয় হয়। আসল কথা হলো জাপানীদের যেমন উৎসাহ দেওয়া হয় কোরিয়ানদের তেমনি কিছুতেই উৎসাহ দেওয়া হয় না। নিজেদের বেঁচে থাকবার জন্য পড়সীকে যতটুকু সাহায্য করা দরকার এর বেশী উৎসাহ অথবা সাহায্য করা হয় না।

পরদিন প্রাতে রওনা হলাম। বেলা দুটোর সময় কাম্বো নামক স্থানে এসে একটি কোরিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। বিকালে কোথাও যাইনি। সন্ধ্যার পরই মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়ি। নিদ্রা খুব গাঢ় হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখি, মশার দংশনে অর্ধেকটা শরীর লাল হয়ে গেছে। এ গ্রামে কোনও জাপানীর বাড়ি নেই। তাই বেলা দশটার সময়েই চললাম। বিকালে একটি ছোট গ্রামে একটি জাপানীর বাড়িতে উঠলাম, এবং তাদের গরম জল দিতে বললাম। গরম জল দিয়ে বেশ ক'রে স্নান ক'রে, দু বোতল গরম দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। জ্বর এল। সিঙ্গাপুর থেকে বার হবার পর এই সর্বপ্রথম আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ল। কোনও ওষুধ খাইনি। রাত্রেই জ্বর ছেড়ে গেল। তার পর দিনটাও তাদের বাড়িতে থেকে বিশ্রাম করি। বিকাল বেলা আমার বেশ ভাল লাগছিল। গ্রামটা বেড়িয়ে এলাম। যতগুলো বাড়ি ছিল প্রত্যেকটিতে কি কি আছে ভাল ক'রে দেখলাম। গ্রামে যে চুরি হয় না তার প্রমাণ, কারও দরজায় কোনরূপ তালা নেই। শুধু ভেজিয়ে দিয়েই লোক শুয়ে পড়ে। প্রত্যেক বাড়িতে তাঁত ও চরকা আছে। কারও বাড়িতে তাঁতে সুতো, কারও বাড়িতে তাঁতে রেশম তৈরী হয়। এসব তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। কাপড় কেউ কেনে না ব'লেই মনে হ'ল। গ্রামে দরজী আছে। দরজী 'সিংগার' মেশিন ব্যবহার করে। তাকে

জিজ্ঞাসা করলাম, জাপানী মেশিন নেই কি? সে ঘাড় নেড়ে বললে, "নেই।" বাস্তবিকই তখনও সিংগার মেশিনের মত কোন হালকা মেশিন জাপানীরা তখনও তৈরী করেনি।

কাইজ নামক এক ছোট শহরের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ এমন এক জায়গায় এলাম, যেখান থেকে তিন দিকে রাস্তা বেরিয়েছে। কোন্ দিকে যাই ভেবে না পেয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলাম। একজন কোরিয়ান এলেন, তাঁরও সঙ্গে সাইকেল। কিন্তু 'কেরিয়ার'টা লোহায় বোঝাই। এই বৃদ্ধ বয়সে এত মাল কি ক'রে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা আমি ভেবে পেলাম না। তিনিও কাইজ যাবেন। একই সঙ্গে চললাম। লোকটি এত বড় বোঝা ঠেলেও আমার সঙ্গে চলতে পেরেছিল। আমরা বিকাল বেলা কাইজ পৌঁছলাম। লোকটি নিজের গন্তব্যস্থানে গেল, আমি গেলাম শহরে।

পিংইয়াং শহরের নাম হয়েছে 'কেজ' এবং এই শহরটির নাম হয়েছে 'কাইজ'। উচ্চারণে একটু ব্যতিক্রম হ'লেই মুশ্‌কিল। পঞ্জাবে যুক্তপ্রদেশে যেমন 'অকট্রয়' বা চুঙ্গি-ট্যাক্স আদায়ের আড্ডা থাকে তেমনি এদিকের শহরগুলিতেও কে আসে কে যায় দেখবার জন্য অকট্রয় আড্ডার স্থলে পুলিশ স্টেশন আছে। এতে আমার সুবিধাই হয়েছিল, পুলিশই আমার থাকার ব্যবস্থা করত। কোরিয়ার পুলিশ স্টেশন জাপানীদের মত। চেয়ার নেই, একটা টেবিল। তার চারি পাশে তিনখানি বেঞ্চ, একটা টেলিফোন। চারজন পুলিশ। ডিউটিতে এসে শুয়ে থাকবার উপায় নেই। ঘরখানাও ছোট। এখানা ইচ্ছা ক'রেই যে ছোট ক'রে তৈরী করা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। কর্মতৎপরতাও বেশ। আমাকে পাওয়ামাত্র বেশী দেরী না ক'রেই সোজা একটি হোটেলে নিয়ে গেল। আবার হোটেলওয়ালাকে কত মিনতি। আমাদের দেশের

পুলিশ এক বিপদে পড়লেই এমন মিনতি করে। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর লতিয়ে পড়েছিল। খাবারের বন্দোবস্ত হল, খেয়েই শুয়ে পড়লাম। পরদিন প্রাতে ঘুম থেকে উঠে শুনলাম অনেকে আমাকে দেখতে এসেছিল। দেরী ক'রে ঘুম থেকে উঠেছি ব'লে হোটেলের মালিক থেকে চাকর পর্যন্ত সবাই হাসতে লাগল। শুনলাম তাদের মতে পর্যটক কখনও প্রাতে ঘুমায় না।

আজ জাপানী পুলিশ আমাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করল। পরীক্ষা ক'রে দেখল আমি মালয় হ'তে, না ভারত হ'তে এসেছি। একজন জাপানী মালয় ভাষায় আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করল। আমিও দ্বিধা না ক'রে উত্তর দিলাম।

কাইজ শহর পুরাতন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোটবড় অনেক বাড়ি তৈরী হচ্ছে। লোকের চলাফেরা দেখলেই মনে হয় তাদের মাঝে উদ্দীপনা আছে। ব্যবসায়ের এখানে বড়ই প্রাধান্য। কয়েকটা কল আছে, অনেকগুলি মজুর খাটে। মজুররা কলে না গিয়েও কলের কাজ নিজেদের বাড়িতে ব'সে করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে হবে, তা বাড়িতে ব'সেই কর, আর কলে গিয়েই কর তাতে ক্ষতি নেই, অবশ্য এ নিয়ম কাজ বুঝে। অনেকের বাড়িতেই ছোট ছোট কল আছে। বিদ্যুতের সাহায্যে সে সব কল চলে। ইলেকট্রিসিটি জলের মত সস্তা বললেও দোষ হয় না। জাপানীরা যে জিনিষের যত বেশী দরকার সে জিনিষটাকেই তারা তত বেশী সস্তা করবার চেষ্টা করে। কোরিয়া থেকেও অনেক মাল বিদেশে চালান যায়। কোরিয়া জাপানেরই একটা অংশ কিনা, তাই পার্থক্য তেমন বেশী নেই। এই শহরটিতে এসে দেখলাম, কোরিয়ানরা যেমন কাজে ব্যস্ত জাপানীরাও তেমনি ব্যস্ত। তবে এখানকার কয়েকজন জাপানী দেখলাম বড়ই দাম্ভিক।

একজন কোরিয়ান আমার একলা একটা ফোটো উঠাতে চেয়েছিল কিন্তু তা হতে দিল না একজন জাপানী, সে আমার কাছে দাঁড়িয়ে কোরিয়ান যুবককে ফোটো উঠাতে আদেশ দিল।

ফোটো যারা তুলেছিল, তারা নদীর ধারে থাকত। তারা তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল। যদি কেউ আমাদের হাড়ী-মুচীদের গ্রাম দেখে থাকেন তবে তিনিই বুঝবেন, আমি কোথায় গিয়েছিলাম। সারিবন্দী দোচালা ঘর, দুটি দিক নুয়ে এসেছে, মাঝটা তার উঁচু। সামনে দিয়ে একটা গ্রাম্য পথ। তার অদূরেই নদী। নদীটাও আমাদেরই দেশের মত। দু দিকে কাদায় ভর্তি, তার পর বালি। একটা বাড়ির বারান্দায় গিয়ে বসলাম। আমাদের দেশে যেমন বেতের মোড়া আছে, তাদেরও সেরূপ আছে। আমি থাকতে থাকতেই ফোটো প্রিণ্ট করা হ'ল।

ওরা আমাকে শশা খেতে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ সেখানে থেকে শহরে ফিরে এলাম। সঙ্গে দুটি যুবকও এল। পথে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা মশা এবং মাছি তাড়াবার বন্দোবস্ত করে না কেন। একজন বললে, "জাপানীরা যা করে, মনে হয় সবই তার উলটো করি।" আমি বললাম, "সেটা ভুল। এরূপ করতে থাকলে কোরিয়ান জাতি একদিন লোপ পাবে, তখন আর প্রতিশোধ নেবার কেউ থাকবে না। তখন আর এ কথা বলবার কেউ থাকবে না যে, 'আমরা একদিন পরাধীন ছিলাম।' আমেরিকান সিনেমা দেখেছ? এখনও আমেরিকানরা বলে, 'আমরা একদা শাসিত হয়েছিলাম'। তোমরাও যদি ওরকম বলতে চাও তবে জাপানীদের যা ভাল সবই গ্রহণ কর।" যুবকটি মাথা নাড়ল।

ফের শহরে এসে হোটেলে গেলাম এবং একটা সুন্দর ঘরে থাকবার ঠাঁই পেলাম। চার্জ এক ইয়েন। যত দিন জাপান ও কোরিয়ায় ছিলাম, থাকা এবং খাওয়ার জন্য কোনও দিন এক ইয়েনের বেশী দিইনি,

এই ছোট অথচ পরিষ্কার শহরটিতে জাপানী সংবাদপত্রের রিপোর্টারও আছেন। পরদিন প্রাতে একজন রিপোর্টারের অফিসে গিয়েছিলাম। তিনি নানা কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর বসবার স্থানের পিছনে বোধ হয় হাজার খানেক বই সাজানো ছিল। তাঁব কথাবার্তার রকম দেখে মনে হ'ল তিনি একজন চতুর জাপানী। বলতে গেলে স্বার্থরক্ষার বুদ্ধিরই নাম চতুরতা। একজন পর্যটকেরও হাতে যে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থহানি ঘটতে পারে, এই সম্ভাবনার বোধেই অতি সাবধান হচ্ছেন দেখে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলাম, আমার এই ভ্রমণে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই, আছে শুধু আত্মতৃপ্তির প্রবল বাসনা। ভদ্রলোক অনেক কথার পর আমাকে বিশ্বাস করলেন এবং এক কথায় বলব, মুক্তিদান করলেন। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অন্যত্র গেলাম।

কাইজ সহরে একটি বড় কোরিয়ান স্কুল আছে। একজন আমেরিকান অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে স্কুলটি চলে। আমি সেখানে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "তা কি হয়, আমাদের সময় নেই।" তখন তাঁকে হাতের সেই বক্তৃতা দেবার অধিকারপত্রটা দেখাতেই হেসে বললেন, "এ যে একেবারে শমন বার ক'রে বসলেন। আসুন আসুন ব্যবস্থা ক'রে দেব।" ব্যবস্থা হ'ল। ভারতের স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যারা মিথ্যা কুৎসা প্রচার করে তাদেরই বিরুদ্ধে বললাম।

৫

কাইজ থেকেই বেশ বড় পথ চলেছে কেজোর দিকে। কেজোর পূর্বনাম শিউল। কেন যেন প্রবল ইচ্ছা হ'ল শিউল চ'লে যাই। সামনে দীর্ঘ পথ। কত মাইল তা জানি না, মাইল-স্টোনে কোরিয়ান ভাষায় মাইল লেখা ছিল। পড়তে পারিনি। দু দিন লেগেছিল শিউল

পৌঁছতে। শিউল যাবার পথেও সঙ্গী পেয়েছিলাম। আমার শরীর ছিল দুর্বল আর ওরা ছিল শক্তিশালী। ক্রমাগত চলা অভ্যাস আছে ব'লেই চলতে পেরেছিলাম। একটা দোকানে দেখলাম 'হরলিক' দুধের মত গুঁড়ো দুধ বিক্রী হচ্ছে। খানিক কিনে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে নিলাম। শিউল এবং কেজোর মাঝে একটা ছোট গ্রামে এসে রাত কাটালাম। ভোর রাতে সঙ্গীদের তুলে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

মাইল দুয়েক আসার পর আমরা একটি নদীর তীরে পৌঁছলাম। নদীর জল স্বচ্ছ। জলে নেমে বেশ করে স্নান করে নিলাম।

শিউল

অবশেষে আমরা শিউল নগরীর কাছে এসে পড়লাম। ক্রমশ লোকের চলাচল বাড়তে লাগল। সে এক দৃশ্য বটে। নানা লোক নগরের দিকে চলেছে। আমরা চলেছি। বড় পথের দু পাশে পূর্বে দেওয়াল ছিল, এখনও তার চিহ্ন আছে বহু স্থানে। আমি 'তংওয়া এলবো' আফিসে সোজা না গিয়ে একটা কোরিয়ান হোটেলে উঠলাম। সেদিনটা কোথাও না গিয়ে বিশ্রাম করা গেল। বাইরে বেরইনি বটে কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য অনেকেই এসেছিলেন। ভারতীয় পর্যটক পপাসোলা এবং বোম্বাসাব নাম ক'রে বললেন এঁরা দুজনেও এ শহরে এসেছিলেন। ভারতীয় পর্যটক ব'লে তাঁদের অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা নিজেদের ভারতীয় বলতে অস্বীকার করেন। বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষ ইরান থেকে এসে বোম্বাই নগরীতে বসবাস করেছেন মাত্র, সময় হ'লেই তাঁরা আবার ইরাণে যাবেন। ভারতবর্ষ পরের অধীন, তাঁরা ভারতে জন্মেছেন

ব'লেই ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়েছেন, বস্তুত তারা ইরানী, স্বাধীন। অতএব ভারতীয় ব'লে যেন তাঁদের অপমান করা না হয়, ইত্যাদি। আমি তাঁদের বললাম, "বন্ধু, আপনারা যেমন খাঁটী কোরিয়ান ও জাপানী আমিও ঠিক তেমনি খাঁটী ভারতীয়। আমার শরীরের রংই তার প্রমাণ। আমি যদিও ব্রিটিশ সরকারের অধীন, কিন্তু গর্বের সহিত বলছি—আমি হিন্দুস্থানের হিন্দু। আমি ইরানী নই, পাঠান নই, মোগল নই—আমি খাস ভারতের হিন্দু। পরাধীন বলে যদি আপনারা আমাকে ঘৃণা করেন, আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন, তবুও বলব না যে, আমি ভারতবাসী নই।" কোরিয়ান এবং জাপানী উভয় সম্প্রদায়ই আমার কথা শুনে সুখী হলেন। সেদিন বিকালে আমাকে জাপানী ছেলেদের তরফ থেকে খাওয়ানো হয়েছিল।

যাদের টাকা আছে তাদের সম্মান দাবী করবার অধিকার আছে। আজ আমি নিঃস্ব নই, কাছে কিছু টাকা আছে, কারও কাছে হাত পাততে হয় না। এটা যেন জাপানী পুলিশের ভাল লাগল না। প্রাতে একজন জাপানী আমার কাছে কাগজ ও পেনসিল বিক্রী করতে এল। তাকে দেখালাম আমার কাছে কাগজ ও পেনসিল দুই-ই আছে। লোকটা তবুও যাচ্ছিল না, এমন সময় দূর হতে একটি কোরিয়ান ছেলে চোখ টিপল। আমি ব্যাপার বুঝে তাকে দশ সেণ্ট অমনি দিয়ে বিদায় দিলাম। তার পর এল কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের ব্যবহার ভালই মনে হ'ল। তারা নানা প্রশ্ন করলে। তার পর যখন জানলে যে আমি রিক্তহস্তে সিঙ্গাপুর থেকে বেরিয়েছি অথচ আমার হাতে এখন প্রায় আড়াই শ' ইয়েন আছে তখন তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠল। কি ক'রে টাকা পেয়েছি তা বললাম। তারা চ'লে গেল বটে, কিন্তু স্পষ্টই বুঝলাম আমার কথায় বিশ্বাস

করেনি। কি ক'রে বিশ্বাস জন্মায় তার উপায় খুঁজে পেলাম না। তার পর থেকেই আমার উপর কড়া পাহারা বসল। এতে হোটেলের মালিক খুব দমে গেলেন। আমার ইচ্ছা ছিল একবার ব্রিটিশ কন্সালের সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু সেদিন তা করলাম না, সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হ'ল। যদি কন্সালের বাড়ী না যাই তবে তিনি নিশ্চয়ই রাগ করবেন, এদিকে যদি যাই তবে এদের সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে। আমি আপাততঃ চুপচাপ থাকাই প্রশস্ত মনে করলাম।

দুপুর বেলা 'তংওয়া এলবো' নামক সংবাদপত্র হ'তে লোক এল। তারা আমাকে তাদের আফিসে সম্পাদকের কাছে নিয়ে গেল। সম্পাদক আমাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করলেন আমি প্রকৃত ভারত-বাসী কি না। আমি যখন বললাম আমি প্রকৃত ভারতবাসী তখন তিনি আমাকে বসালেন এবং জলযোগের বন্দোবস্ত করে একটা নির্জন ঘরে নিয়ে গেলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসা আন্দোলন চালাচ্ছেন তা ঠিক কি না, আর যদি ঠিক হয় তবে কি ক'রে সে পথটি কার্যকরী হ'তে পারে? আমি তাঁর কাছে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, "যদি দেশের লোক সকলে একমত হয় তবে এর চেয়ে বড় অস্ত্র পৃথিবীতে আর নেই।" কিন্তু আমাকে একটু জোরের সঙ্গে অথচ ধীরে বললেন, "অর্থ যে অনর্থের কারণ তা আমরা জানি, কিন্তু এই অর্থের সাহায্যে যদি দেশের লোক বিভক্ত হয়ে পড়ে তবেই কাজটি আর হবে না। ভারতে কি সেরূপ বিভক্ত হবার সম্ভাবনা নেই?" বুঝতে পারলাম, কোরিয়াতে ভারতের সংবাদ মোটেই যায় না। 'তংওয়া এলবো' আফিস থেকে Seul Press ব'লে অন্য একখানা ইংরাজী দৈনিকও বার হয়। তার সম্পাদকীয় বিভাগে কোরিয়ান এবং জাপানী উভয়ই

আছেন। একজন কোরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, "Now let us see that Ilbon Saran।" অর্থাৎ 'এইবার আমরা জাপানীটির কাছে যাই চলুন।' জাপানীদের কোরিয়ানরা "ইলবন সারণ" বলে। একজন জাপানী ভদ্রলোক আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। লোকটির কথা শুনে কিন্তু কেমন যেন দুমুখো কথা ব'লে মনে হতে লাগল। সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, কোরিয়ায় জাপানী রাজত্বই বোধ হয় তাঁর পছন্দ হয়? তিনিও সোজা উত্তর দিলেন, যদি কোরিয়ানরা জাপানীদের মত একটা পৃথক রাজত্ব গ'ড়ে তুলতে চায় তবে তিনি রাজী নন। তবে যদি কোরিয়ানরা রুশিয়ার মত রাজ্য তৈরী করে তো তিনি সুখী হন। জাপানীর মত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী শাসক স্পষ্ট বলছে শাসিত কোরিয়ানরা রুশিয়ার মত রাষ্ট্র গ'ড়ে তুললে সে সুখী হবে। এমন অদ্ভুত কথা এই প্রথম শুনলাম। জাপানীরা বড়ই কম কথা বলে। অল্পভাষীর কথায় অবশ্যই গুরুত্ব আছে।

একদিন এই কোরিয়ার লোক মাঞ্চুরিয়া দখল করেছিল। শাদা রাশিয়ানদের কোণঠাসা করেছিল। মেরিটাইম প্রদেশ থেকে যখন রুশরা চীনাদের সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাইবেরিয়াকে চীনা-শূন্য করেছিল সেদিনও কোরিয়ানরা বীরদর্পে রুশদের অগ্রগতি রোধ করেছিল। কিন্তু কোরিয়ানদের আর সেদিন নেই। এখন কোরিয়া জাপানের অধীন। তার কারণ, জাতীয়তাবোধের অভাবে। জাতীয়তাবোধের অভাবেই একদা কোরিয়া পরাধীন হয়েছিল। এখনও অনেক কোরিয়ানের মনে জাতীয়তাবোধ নেই। এখনও অনেকে মনে করে, দিনান্তে শাকান্ন যদি কোনও মতে জোটাতে পারে, যদি রাজকর দিতে পারে তবেই যথেষ্ট। এসবই বোধ হয় কোরিয়ার পতনের কারণ। অবশ্য সুখের বিষয় এই যে, কোরিয়ান

নবীন-নবীনার মনোভাব আজ ভিন্ন। আজ জাগরণের স্বপ্ন তাদের চোখে।

জাপানের বিক্রমের কথা কে না জানে। জাপান কোরিয়ার চারিদিকে গড কেটে বসেছে, তার পর ঢুকেছে গ্রামে গ্রামে। রণসম্ভার কোরিয়াতে এত মজুত আছে যে জাপানীরা ইচ্ছা করলেই কোরিয়াকে অবিলম্বে জনহীন করতে পারে। তথাপি নিরুপায় কোরিয়া মাঝে মাঝে হাতিয়ার উঠায়, কিন্তু ফল কিছুই হয় না। কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী যুবক-যুবতী নানা মুক্তিপথের সন্ধানে থাকে। তাই নানা দেশের মুক্তি-সংগ্রামের তত্ত্ব জানবার জন্য তাদের প্রবল আগ্রহ।

জাপানে যে পার্লামেন্ট আছে তার ক্ষমতা যে কত, জাপানের লোকই ভাল বোঝে। প্রথমে আমাকে যেরূপ বোঝানো হয় তাতে মনে হয়েছিল এটা একটা জনমতের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যিনি এর লাগাম ধ'রে আছেন তাঁকে আমি আমার স্বল্প বুদ্ধিতে যা বুঝেছি তাতে এই জনপ্রতিষ্ঠানকে একটা ভুঁয়ো জিনিষ ব'লেই আমার মনে হয়েছে। মুসোলিনি, হিটলারের কাউন্সিলের মতই আদেশ মান্য করাবার এটা একটা কল মাত্র। এজন্যই বোধ হয় অনেক স্বাধীনচেতা যুবক জাপানী পার্লামেন্টের অদল-বদল করতে চায়। তবে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাদের যতই ভক্তি থাক, সংস্কার বা একটা জাতির প্রতি জন্মগত বিদ্বেষকে ভুলে যাওয়া সহজ কথা নয়। মুখে অনেক কথা বলা চলে, কিন্তু কাজের বেলা অভ্যাসবশে ভিন্ন আচরণ ঘটে। যদিও জাপানীরা দেখছে ও স্বীকার করছে যে, সমাজতন্ত্র উত্তম জিনিষ এবং বৃহৎ ভাবধারার উপর তা গড়া, তবুও সমাজতন্ত্রী কোরিয়ানদের দলে এসে মনেপ্রাণে তারা ভিড়তে পারে না। কোরিয়ার যাঁরা বড বড চাঁই তাঁরা খুব মাথা খাটিয়েছেন জাপানীদের দলে টানবার জন্য,

কিন্তু 'Black Dragon'এর গুরুভার দেহ ও মনকে তাঁরা টলাতে পারেননি।

তরুণ কোরিয়ানরা যে তরুণ জাপানীদের উপর সমাজতন্ত্রের মোহ বিস্তার করবার চেষ্টা করছে, রক্ষণশীল জাপান সে কথা জানে। অতএব সেদিকে কোরিয়ার আশা কম। তবুও অবশ্য কাজ চলছে। যেদিন জাপানীরা প্রকৃতই মাঞ্চুরিয়া দখল করে, সেদিন তরুণ কোরিয়ান সুখী হয়েছিল। ভেবেছিল এতে চীনাদের চোখ খুলবে, মঙ্গল হবে। তারা একত্র হয়ে সামান্য কিছু অস্ত্রের সংস্থান করতে পারলেই হয়ত কাজ হবে। অবশ্য যে পর্যন্ত না নবীন কোরিয়া দেখবে যে চীনের সেপাই আনতং পার হয়ে কোরিয়ায় এসে পড়ল সে পর্যন্ত তারা জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে না। চীন যে সত্বর একতাবদ্ধ হবে সে লক্ষণ যদিও এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবু কোরিয়ানরা আশা ছাড়েনি। চীন দেশের একতার সুরু হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে।

তরুণ কোরিয়ার এও আশা ও কামনা যে, জাপানী গায়ে প'ড়ে রুশের সঙ্গে লড়াই বাধাক। ব্লাডিভষ্টক বন্দরটির প্রতি দৃষ্টি ক'রে দেখুন জাপানের প্রিয় হকাইদো ব্লাডিভষ্টক থেকে কত দূরে। রুশদের উড়োজাহাজ জাপানীদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, জাপানীরা কি নিশ্চিন্তমনে ঘরের কোণে বসে থাকতে পারে। রুশ নানা কারণে চুপচাপ। যদি ভাগ্যের জোরে সে-রকম কিছু ঘটে যায় তবে নবীন কোরিয়া একবার নড়বে, মার খাবার চেষ্টা করবে বাঁচবার জন্য। শিউলে এসে আমি এই রকমই বুঝলাম।

শিউলে অনেক মেয়েদের স্কুল আছে। তাঁরা স্বেচ্ছায় একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন—ইচ্ছা, ভারতের নারীজাতি সম্বন্ধে কিছু শোনেন। তবে বক্তৃতার আকারে নয়, কথাবার্তা, প্রশ্নোত্তরের

আকারে। তাঁরা দোভাষী ঠিক করেছিলেন চীনের ক্যাণ্টন শহরের এক বাসিন্দাকে। সর্বপ্রথমে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলাম এত আমেরিকা-ফেরত কোরিয়ান থাকতে একজন চীনা দোভাষী এনে হাজির করার মানে কি। যা উত্তর দিলেন তা'র তাৎপর্য এই যে, কোরিয়ার পুরুষেরা নাকি স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে অনুদার। মেয়েরা চিরদিন তাদের অনুগত দাসী হ'য়ে থাক, এই তাদের ইচ্ছা। তাই অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের কাছে সত্য প্রকাশে তাদের স্বাভাবিক সংকোচ। আমার কথা পাছে যথাযথ তাঁদের না শোনানো হয় তাই চীনা দোভাষীর ব্যবস্থা। ভারতের নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁরা যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তা পূর্বে অনেক শুনেছি এবং অনেকবার তা লিখেছি। পূর্বকালের ভারতীয় নারীজাতির গৌরবের কথা তাঁরা মোটেই শুনতে চাইলেন না, বললেন তাঁরা আজকালকার মেয়েদের কথা শুনতে চান। যথাশক্তি বললাম। তাঁরা শুনে সুখী হলেন যে ভারতের মেয়েরাও তাঁদের উন্নতির প্রচেষ্টায় আছেন।

শিউল নগরীর অনেকগুলি পুরণো বাড়ি, গলিপথ, পুরণো কূপ প্রভৃতি দেখে হঠাৎ একবার ব্রিটিশ কন্‌সালের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। কন্‌সাল মহোদয়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা হ'ল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, এখনও তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের পিপাসা মেটেনি। পৃথিবী ভ্রমণ কাজটা কঠিন হ'লেও মধুর।

শিউলে ব'সে থাকতে ভাল লাগল না। আমার মনে হ'ত যেন আমি জেলের মধ্যে আবদ্ধ। যখনই গিয়ে হোটেলে বসতাম, একজন কোরিয়ান যুবক আসতেন আমার সঙ্গে তর্ক করতে। তিনি যেসব কথা তুলতেন তা আমার একটুও ভাল লাগত না। তিনি বলতেন, "ঐ দেখুন জাপান পৃথিবীর আলো, প্রাচ্যের আলো। এমন জাতের

সহায়তা করা সব এশিয়াবাসীর কর্তব্য।" ব্রিটিশ সরকারের উপরও মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করতেন। যে লোক আপন দেশের সম্মান ভুলে গিয়ে, পরাধীনতার বেদনা ভুলে গিয়ে পঞ্চমুখে শাসকজাতির প্রশংসা করতে পারে সে লোক অবিশ্বাস্য ও অব্যবস্থিতচিত্ত। এমন লোকের সঙ্গে বৃথা তর্কে সময়ক্ষেপ করতে একটুও ভাল লাগত না। অনতিকাল পরেই আমি শিউল থেকে বিদায় নিলাম।

বিদায়ের দিন রাত্রে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি অনেকদিন আমেরিকায় ছিলেন। তিনি বললেন, "চলুন আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি। মাত্র তিনটি স্টেশন।" তাঁরই আতিথ্য স্বীকার করব ঠিক করলাম। কারণ শিউলে মনটা আমার ভাল ছিল না। তিনি বলে গেলেন পরদিন এগারটার সময় এসে নিয়ে যাবেন। তিনি ঠিক সময়েই এসেছিলেন। সাইকেলখানা 'বুক' করলাম আধ ইয়েন দিয়ে। নিজেকে 'বুক' করতে লাগল মাত্র সত্তর সেণ্ট। ভদ্রলোক বললেন, "দুটি অনুরোধ আছে। এক হ'ল—যখন জাপানে যাবেন, সাইকেলসুদ্ধ একদিন ট্রেনে উঠবেন। আর—জাপানে গিয়ে জাপানী ছেলেকে একটি চপেটাঘাত করবেন।"

ভদ্রলোকের বাড়িতে পৌছন গেল। তাঁর অনেকগুলি ছেলেপিলে। স্ত্রী তাঁর বৃদ্ধ নন, তবে প্রৌঢা বটে। আমার আগমনে তাঁদের বাড়িতে উৎসবের ব্যস্ততা প'ড়ে গেল। এরকম উৎসবে বাঙ্গালী হিন্দু অতিথির জন্য পাঁঠা কাটেন, মুসলমান বোধ হয় মুরগীর ব্যবস্থা করেন। আমার জন্য ব্যবস্থা হ'ল একটি কুকুরের। পূর্ববঙ্গে সরাইল নামক পরগণার কুকুর প্রসিদ্ধ। বিকালে ভোজনার্থ এই জাতীয় একটি কুকুর চার ইয়েন দিয়ে কেনা হয়েছে। কুকুরটি এনে রাখা হয়েছে দরজার সামনেই। কুকুরটি যেন বুঝেছে তার মৃত্যু সন্নিকট, তাই চুপচাপ

রয়েছে। নাগাদের হাতে পড়লে কুকুরের যে অবস্থা হয়, এই কুকুরটিরও সেই অবস্থা। আমাকে সানন্দে বোঝানো হ'ল, এই কুকুরটিকে আমার ভোজের জন্য বধ করা হবে। আমি তাতে আপত্তি জানিয়ে বলি, যদি এই কুকুরকে বধ করা হয়, তবে এখনই তাঁদের গ্রাম ছেড়ে আমি চলে যাব। ভদ্রলোক বড়ই দুঃখিত হলেন এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কি পরামর্শ করলেন, আমি ব্যাপার বুঝে ভদ্রলোককে বললাম, এই কুকুরটি কাল সকাল পর্যন্ত আমারই কাছে থাকবে, যদি ইচ্ছা হয় তো কাল সকালে কিনে নিয়ে যাব, যদি না নিই তো কাল তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ভদ্রলোক আমার কথায় রাজী হলেন বটে, কিন্তু আমার প্রতি বোধ হয় কিছু বিরক্ত হয়েছিলেন। কুকুর বধের ব্যবস্থা দেখে আমার এত ঘৃণা হয়েছিল যে চিনি দিয়ে ভাত খেতেও সেদিন আমার গা বমি বমি করেছিল। পরদিন প্রাতেই ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে কুকুর সমেত বিদায় নিই। কুকুরটা মুক্ত হয়েই আমার সঙ্গে চলতে লাগল। আমি মনে মনে ভাবলাম যদি কুকুরটাকে সাইকেল টানার কাজে লাগাতে পারি তো ভাল হয়। কি উপায়ে সাইকেল টানাবো তা অনেক ভাবলাম, কিন্তু কাজ হ'ল না। কেননা আমার সঙ্গে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা নেই, তার পর সাইকেলের অনেক অংশ এরই মধ্যে শিথিল হয়ে পড়েছে। কুকুরটা দুপুর বেলা পর্য্যন্ত বেশ দৌড়ল, তার পর হাঁপিয়ে পড়ল। দেখলাম মাঝে মাঝে সে ঝোপে গিয়ে বসতে লাগল আবার আমার পিছন নিতে লাগল। আমি শুধু কুকুরটার জন্য সেদিন বেশী দূর যেতে পারলাম না, একটা গ্রামে রয়ে গেলাম।

গ্রামে কুকুরের গলায় একটা মোটা চামড়ার বেল্ট করিয়ে নিলাম এবং বেল্টের সঙ্গে একটা মোটা রশি বেঁধে দিয়ে তা সাইকেলের

হাতলের নীচে বাঁধলাম। অর্থাৎ ঘোড়ার মত কুকুরটা সাইকেলে বাঁধা পড়ল। কুকুর টানতে লাগল, আমি আস্তে আস্তে প্যাডেল করতে লাগলাম। দেখলাম ঠিকমত অভ্যাস করাতে পারলে সাইকেল টানার কাজে কুকুরটাকে বেশ লাগানো যাবে।

বিকাল বেলা তারই মহড়া দিলাম। পরদিন কুকুরকে বেশ ক'রে খাইয়ে পথে এলাম। কুকুর চলতে লাগল, আমিও আনন্দে আস্তে আস্তে প্যাডেল চালাতে লাগলাম। অন্য দিন সাইকেল চালাতে চালাতে আমার নিজেরই শক্তি খরচ করতে হ'ত, আজ আমি ও কুকুর এই দুজনের শক্তিতে সাইকেল চলতে লাগল।

৬

বিদেশে থেকেও আজ আমার আনন্দ। কোরিয়া ভারত হ'তে বহু দূরে। সেই ভারতেরই বুদ্ধদেবের বাণী দেখলাম কোরিয়ার সর্বত্র। সেই কারণেই আমার আনন্দ। বুদ্ধদেবের বাণী সে দেশে কে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমি জানি না। যেই এনে থাকুন, তিনি ভারতের গৌরবই বহন ক'রে এনেছিলেন। কুকুর আমার সাইকেল টানছে, পরিশ্রম আমার কম, তাই এত সব ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। কিছুদূর গিয়ে এক মোটর-চালকের বাড়িতে উঠলাম। মোটর-চালক আপন মনে মোটর মেরামত করছিলেন। আমরা একে অন্যের কথা বুঝি না, তবুও কোরিয়ান লোকটি আমাকে বসবার আসন দিলেন, কুকুরটিকে কিছু খেতে দিলেন। কুকুরটা আরাম ক'রে শুল। আমি ব'সে ব'সে মোটর-চালকের কাজ দেখতে লাগলাম। শ্রান্ত হইনি, বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল না। তাই একটু ব'সেই উঠে পড়লাম।

মাঝে মাঝে পথ ছোট হয়ে গেছে। মনে হ'ল অনেক দিন মেরামত হয়নি। কিন্তু পথ পরিষ্কার। পথ পরিষ্কারের জন্য এ-দেশে আলাদা লোক রাখা হয় না। যে গ্রামের পাশ দিয়ে পথ চ'লে গেছে সেখানকার লোকদেরই তা পরিষ্কার রাখতে হয়। এতে জাপানী বাসিন্দারাও বাদ পড়ে না, তাদেরও পথ পরিষ্কার করতে হয়। সবাই স্বেচ্ছায় কাজ করে, বাধ্য করতে হয় না। জাপানের নাকি টাকার দরকার, তাই ব্যয়-সংকোচের এই ব্যবস্থা। আমার কিন্তু অন্য ধারণা। ইউরোপীয় ধরণে কর্তব্যজ্ঞান শিক্ষা দানের জন্যই এই ব্যবস্থা। ইউরোপীয় কর্তব্যজ্ঞান কোরিয়ানদের মধ্যে নানাভাবে এসে দেখা দিয়েছে। যদি কোনও সরকার-বিরোধী কোরিয়ান প্রাণভয়ে কারও বাড়িতে আশ্রয় নেয় তবে তাকে আশ্রয় দেওয়া তারা কর্তব্য ব'লে গণ্য করে এবং সেজন্য পলাতককে লুকিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। চীনাদের যেমন অর্ধপথে বৈঠা ভেঙ্গে যায়, কোরিয়ানদের সেরূপ হয় না। তাদের মাঝী মরে তবু বৈঠা ভাঙ্গে না। সেজন্যই জাপান সরকার কর্তৃক মাঝে মাঝে কোরিয়ান গ্রামকে গ্রাম উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয় শুনেছি।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, কোরিয়ানদের মধ্যে এত বিদ্রোহভাব থাকা সত্ত্বেও কি ক'রে তারা জাপানের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে চলে। এমন ঘটনাও শুনেছি যে-সকল নাবিক মাত্র এগার ইয়েন মাইনে পায় তারাও পূরো এক মাসের মাইনে রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ওয়ার ফাণ্ডে দিয়ে দিয়েছে। এসব হয়, হবেও, সকলের মন কিন্তু সমান নয়। তা ব'লে কোরিয়ানরা জাপানী কবল হ'তে মুক্ত হবার জন্য যে চেষ্টা করে না, তা আমার মনে হয় না।

স্থইসেন পর্যন্ত পৌছতে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু কষ্ট বড

হ'ল না। তবে সঙ্গের কুকুরটার হাঁপানি দেখে মনে হ'ল তার খুব কষ্ট হ'য়েছে। সুইসেনে এসেই সেদিনকার মত বিশ্রামের ব্যবস্থা করলাম এবং সঙ্গের কুকুরটিকে একটি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোককে দিয়ে দিলাম। যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে তারা কুকুরের মাংস খায় না। 'সুই' শব্দটা উচ্চারিত হয় ছুই-এর মত, মানে 'জল'। 'সেন' শব্দটা উচ্চারিত হয় 'ছেন'-এর মত, মানে 'প্রচুর'। যেখানে প্রচুর জল আছে তাকে সুইসেন বলে। আসলে কিন্তু স্থানটিতে জলাভাবই আছে ব'লে মনে হ'ল। দুই দেশের দুটি শব্দ নিয়ে 'সুইসেন' শব্দের জন্ম হয়েছে, একটি হ'ল চীনা, অপর শব্দটি হ'ল জাপানী। জাপানীদের লেখায় প্রায়ই চীনা শব্দের মিলন দেখেছি। মনে হ'ল চীনা ভাষা তারা বাধ্য হয়েই শেখে। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে চীনা ভাষারই প্রচলন বেশী।

কাছেই রেলস্টেশন। স্টেশনটি বেড়িয়ে দেখলাম। স্টেশনমাস্টার জাপানী, অন্যান্য অফিসাররা প্রায়ই কোরিয়ান। স্টেশনমাস্টারকে নানা কাজ করতে হয়। মাঝে মাঝে প্লাটফর্ম পর্যন্ত ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হয়। স্টেশন পরিষ্কৃত রাখবার জন্য ঝাড়ুদার নিযুক্ত হয় না। যারা স্টেশনে কাজ করে তাদের পালা ক'রে এ কাজটিও করতে হয়। স্টেশন স্টাফের পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করতে হয় বলে শুনেছি।

স্টেশন থেকে ফিরে এসে জাপানী হোটেলে ব'সে আরাম করছি, এমন সময় একজন পুলিশ এসে বললেন, "এখানে একটি দেখবার মত স্থান আছে, চলুন।" সঙ্গে হোটেলওয়ালাও চললেন। দেখবার স্থান আর কিছুই নয়, রেলস্টেশনের আশপাশে বড় বড় দোকান, তাতে যে বিজলী বাতি দেওয়া আছে তার আলোয় চারিদিক দিবালোকের মত

উজ্জ্বল হয়েছে। তাই দেখাতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন সুন্দর স্থান ভারতে আছে কি না তা জিজ্ঞাসা করতেও ভোলেননি। আমি যখন বলনাম অনেক আছে, তখন পুলিশ বললেন, তা হ'তে পারে না। পুলিশের লোকটি কলকাতা থেকে লাহোর ঘুরে বোম্বাই পর্যন্ত বেড়িয়েছেন, তাই তাঁর এত বড় কথা। তিনি বললেন, "এক কলকাতা ছাড়া ভারতে এমন সুন্দর স্থান নেই।" যাক, আশ্বস্ত হলাম। তিনি বললেন, "এক কলকাতা ছাড়া প্রত্যেক শহরেই পথকে অবরোধ ক'রে রাখা যেন লোকেব অভ্যাস, দেখুন তো সেরূপ এখানে আছে কি?" আমি তর্ক করলাম না। দু-একজন জাপানী ভদ্রলোক কিছু অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, আমি কিন্তু নিইনি। তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, বিদেশী পর্যটককে সাহায্য করা তাঁদের কর্তব্য। অনেক ইউরোপীয় পর্যটককে তাঁরা সাহায্য করেছেন, ভারতীয় পর্যটককে সাহায্য করতে পেলে তাঁরা অশেষ গৌরব অনুভব করবেন। আমি বলেছিলাম, যে পর্যন্ত শ্রীযুক্ত আল্লাদিত্যাব দেওযা টাকা শেষ না হয়, সে পর্যন্ত আমি হাত পাতব না। শুনে তাঁরা সুখী হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত আল্লাদিত্যা একজন চক্ষু চিকিৎসক। চীন সীমান্তের আন্‌তং-এ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তিন শত ইয়েন দিয়ে বলেছিলেন, জাপানীদের কাছে যেন আমি হাত না পাতি, এতে ভারতের বদনাম হবে। জাপানীরা এখনও পর্যটক সম্বর্ধনা শেখেনি।

ওদের সঙ্গে ভ্রমণ সমাপ্ত ক'রে হোটেলে এসে শুয়ে পড়লাম। কি সুন্দর সে ঘর। এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আমাদের দেবতার ঘরও নয়। একটিও বাজে জিনিষ নেই, আছে শুধু লেপ তোষক। তাও ইচ্ছা করলে ঘরের দেরাজে বন্ধ ক'রে রাখা যায়। তখন ঘর একেবারে খালি থাকে। এদের পরিচ্ছন্নতা আর পারিপাট্য সম্বন্ধে অনেকে বই লেখা

হয়েছে। আমার মনে হয়, এই পরিচ্ছন্নতা আর পারিপাট্যই জাপানী জাতির উন্নতির মূল। যে জাতির স্বভাবে জড়তা নেই, একমাত্র তারাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। অথবা পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসের জন্যই জাতির চরিত্রে আলস্য বা জড়তা ঠাঁই পেতে পারে না। পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসই জড়তা ঘোচাবার অমোঘ অস্ত্র। পারিপাট্য বিধানের অনুশীলনে জাতির রুচিও মার্জিত হয়। ঘরের কোথায় কোন্ জিনিষ রাখা শোভন ও আবশ্যক, এসবের অনুশীলনে জাতির শৃঙ্খলাজ্ঞান কম বৃদ্ধি পায় না।

সুইসেন থেকে তান্-এন নামক স্থানে আসি এবং অরণ্যপথে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করি। পথটা একটু পাহাড়ে। পাহাড়ের দুদিকে গ্রীষ্ম এবং শীতপ্রধান দেশের দুরকমই গাছ দেখা যায়। তারপর তাইডেন নামক এক সমৃদ্ধ শহরে আসি। এই শহরে তিন দিন ছিলাম। এই তিনটে দিন আমি অনবরত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কোরিয়ান এবং জাপানী উভয়ে মিলে কি ক'রে কুটীরশিল্পের উন্নতি করছে তা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখেছিলাম, দেখবার মত জিনিষ বটে। বাড়িতে বাড়িতে দালাল ঘোরাফেরা করছে। কাউকে দাদন দিচ্ছে, কারও কাছ থেকে তৈরী মাল কাঠের বাক্স ভর্তি ক'রে ফুসান নামক বন্দরে চালান দিচ্ছে।

চীনে এবং জাপানে প্রায়ই চীনামাটির বাসন ব্যবহার হয়। চীনামাটির পাত্র কম মজবুত নয়। কিন্তু কোরিয়াতে আমাদের দেশের মত সবই পিতলের এবং কাঁসার। রোজই পরিষ্কার করতে হয়। তারপর কোরিয়ানদের 'চপস্টিক', যা দিয়ে ওরা খায় তাও পিতলের। এসব পরিষ্কার রাখতে কোরিয়ানদের বড়ই বেগ পেতে হয়। জাপানীরা খাবার বেলা কাঠের কাঠি ব্যবহার করে এবং খাওয়া হয়ে গেলেই ভেঙ্গে ফেলে দেয়, যেমন আমরা দাঁতন ফেলে দিই।

জাপানে আর চীনে এসব খুবই সস্তা, কিন্তু কোরিয়াতে এসব পিতলের ব'লে বড়ই দাম। কুটীরশিল্প সফল করতে হ'লে এসব কমাতে হয় বলেই জাপানী ভাবাপন্ন কোরিয়ানরা কাঁসার এবং তামার বাসন কমিয়েছে। যাদের বাড়িতে কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠিত তাদের খাওয়ার পদগুলি পুষ্টিকর কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। এতে বাসন কেনার খরচ কমেছে, বাসন পরিষ্কার করতে যে সময় নষ্ট হ'ত সেটা কুটীরশিল্পের কাজে লাগানো হয়েছে। জাপানীরা অনাবশ্যক রক্ষণশীলতা আদৌ পছন্দ করে না। বৃহত্তর প্রয়োজনে দরকার হ'লে তারা গৃহস্থালীতে প্রতিষ্ঠিত বাপপিতামহের আচার-আচরণ অনায়াসে বর্জন করতে পারে। মনে আছে, মালয় স্টেটের ত্রেঙ্গানু নামক স্থানে এক মালাবারী ভদ্রলোক কোনও এক জাপানী কোম্পানীতে কাজ করতেন। তিনি একবার জাপানীদের প্রাচীন রীতি বর্জনের নিন্দা প্রচার করেছিলেন ব'লে জাপানীদের হাতে বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার লাভ করেছিলেন। নানা অসুবিধা সহ্য ক'রে, নানা প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য ক'রে তবে এরা কুটীরশিল্পকে সমুন্নত করেছে।

কুটীরশিল্পে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কাজ করা দরকার। কুটীরশিল্প চালিয়েও অনেক জাপানীকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি অন্য কাজও করতে দেখেছি। অনেক কোরিয়ানও তাই করে।

যেসব সংসারের লোক কুটীরশিল্পে রত, তারা প্রাতে সাতটা, সাড়ে সাতটায় খেয়ে নেয়। ছেলেপিলেদের স্কুলে বিদায় ক'রে, পরিবারের যারা ক্ষেতে কাজ করে তাদের কাজে পাঠিয়ে বেলা এগারটা পর্যন্ত তারা শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকে। দুটো পর্যন্ত অন্যান্য কাজ করার পর কিছু খায়। চারটের সময় খেলা কিংবা বই পড়া, সিনেমা দেখা ইত্যাদি, সাতটার সময় খাওয়া এবং বেড়ানো, তারপর এক ঘণ্টা পূরোদমে

কাজ ক'রে নিদ্রা। কুটীরশিল্পের সাফল্যের জন্য এক দিকে যেমন সাধারণের সাধনার প্রয়োজন অন্য দিকে তেমনি সরকারের সাহায্যেরও দরকার। যদি জাপান সরকার জাপানী ভাবাপন্ন কোরিয়ানদের কুটীর-শিল্প রক্ষা না করতেন তবে এখানকার কুটীরশিল্প এমন ক'রে গড়ে উঠতে পারত কি না সন্দেহ। যে মাল তৈরী করে, সে খবর রাখে না তার মাল কোথায় কত দামে বিক্রী হচ্ছে। সে শুধু তৈরী ক'রেই চলেছে, মজুরি আর মালের দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েই তার কাজ শেষ। বাজার তৈরী আর মাল চালানের ব্যবস্থাও সরকার করেন।

তাইডেনে কুটীরশিল্পের ব্যাপার দেখে মনে মনে ভেবেছিলাম, যদি দেশে ফিরতে পারি তবে কুটীরশিল্প কি ক'রে গ'ড়ে ওঠে তা ভাল ক'রে বলতে চেষ্টা করব। কিন্তু দেশে এসে দেশের অবস্থা দেখে সে অভিপ্রায় বর্জন করেছি। বিদেশে রপ্তানির কথা ছেড়ে দিয়ে যদি অন্তর্বাণিজ্যের কথাও ধরি তবুও কুটীরশিল্পের প্রসার ও প্রচারের কোনও পথ এদেশে দেখছি না। দেশে যেসব রেলপথ আছে তারা কখনও কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য কন্‌সেশন দেয় না। ধরা যাক, কলকাতাতে যে খদ্দর তৈরী হ'ল তা যদি একটা লোককে সঙ্গে দিয়ে ঢাকায় পাঠাতে হয়, তবে লোকটির পূরো ভাড়া দিতে হবে, উপরন্তু মালের জন্যও মণ-করা ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু কোরিয়ায় তা নেই। যে লোক মাল নিয়ে যাবে তার ভাড়া সাধারণ ভাড়ার চতুর্থাংশ মাত্র। মালও এমন অল্প ভাড়ায় পাঠানো হয় যাকে ভাড়া বলা যেতে পারে না। তার উপর জাপানী মাল এসে যদি আমাদের দেশের কুটীরশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে থাকে তবে সে কুটীরশিল্পকে কি ক'রে গ'ড়ে তোলা যাবে তার উপায় দেখছি না।

কোরিয়ান মজুরদের দৈনিক এক ইয়েন কুড়ি সেণ্ট হিসেবে মজুরি

দেওয়া হয়, তারপর মালের দাম, ট্রেন্সপোর্ট ইত্যাদি এবং মূলধনের মামুলি লাভ রেখেই বিদেশে মাল চালান দেওয়া হয়। ভারতে যারা কুটীরশিল্পের কথা ব'লে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন তাদের নানা কথা জানা চাই, তারপর তাদের চিৎকার করা উচিত।

হাতে কাজ ক'রে কিন্তু কূল পাওয়া যায় না। মেশিনের দরকার হবেই। পৃথিবীর অগ্রগতির সঙ্গে যদি পা ফেলে চলতে হয় তবে কুটীর-শিল্প চালাতেও কলের দরকার হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যেমন কাঠ পেনসিল। একজন লোক হাতে ক'রে কখানা কাঠ পেনসিল তৈরী করতে পারে? যদি কাঠ ও সীস কলের সাহায্যে তৈরী করা হয়, কল দিয়ে চাপ দেওয়া হয়, তবে বার বছরের বালকও একটা ছোট কলের সাহায্যে চার ঘণ্টায় এক হাজার কাঠ পেনসিল তৈরী করতে পারে। কুটীরশিল্প মানে বৈজ্ঞানিক প্রথা মেনে ছোট ছোট কলের সাহায্যে আপন আপন পরিবারে থেকেই কাজ করা, এটা মনে রাখতে হবে। কোরিয়াতে কুটীরশিল্প যেভাবে গ'ড়ে উঠেছে তাতে জাপান থেকে কোনও জিনিষ আর কোরিয়াতে আমদানী করতে হয় না। বরং জাপানীর সাহায্যে এখন নানা জিনিষ বিদেশেই চালান যায়। কোরিয়ার কুটীরশিল্পের উন্নতির কারণ জাপানীরাই। জাপানীরাই কোরিয়ানদের কুটীরশিল্পে টেনে নামিয়েছে। দিয়েছে ছোট ছোট কল, অনেকটা বাধ্য করেছে কাজ করতে, তবেই তাইডেন আজ কুটীরশিল্পের রাণী হয়েছে। এদিকে তাইডেনে সন্ধ্যার পর যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আনন্দে পথ চলে, হাসে, হাসায়, পয়সা খরচ করে। কারও চাকর নয়, স্বাধীন-ভাবে, স্বাধীন চিন্তায়, আনন্দে, সুনিদ্রায় রাত্রি কাটায়। সকালে উঠে যে কলে দৌড়াতে হবে, টাইম-কীপার চোখ রাঙ্গাবে, দেরীর জন্য মাইনে কাটা যাবে, অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কিল-ঘুষি খেতে হবে, সে ভাবনা

তাইডেনের লোকের নেই। তাদের ভাবনা, কখন নূতন অর্ডার আসবে, কি ভাবে বেশী কাজ করা যাবে, আপন পবিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি ভাবে বজায় থাকবে—এইসব। স্বাধীন ব্যবসায়ের মর্যাদাই আলাদা।

আমাদের দেশে বড বড কলে কি কাজ হয় সকলেই জানে। কিন্তু কোরিয়ার তাইডেনে এবং অন্যান্য শহরে কোথায় কি হয়, আগন্তুক সহজে তা বুঝতেও পারে না। এদেশে কুটীরশিল্পের ইহাই বৈচিত্র্য। মজুর বলতে পারে না তৈরী মাল কোন দেশে ব্যবহার হবে। দশ লক্ষ মাল তৈরীর আদেশ হয়েছে তা তৈরী ক'রে দিয়েই সে খালাস। এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে, কোরিয়া এবং জাপানের কুটীরশিল্পই বড বড কারখানার প্রাণ।

তাইডেন শহর পার হয়ে একটা ছোট গ্রামে এক কোরিয়ানের বাড়িতে অতিথি হলাম। লোকটি বেশ আগ্রহের সহিত আমার রান্নার ব্যবস্থা করে দিলে। নিজে রান্না করে তার বাড়িতে খেয়েছিলাম। খেয়ে শুয়েছি, এমন সময় অন্য একজন লোক এসে চুপিচুপি গৃহস্বামীর সঙ্গে কি কথাবার্তা আরম্ভ করল। বতক্ষণ পর গৃহস্বামী ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে গিয়ে একটা বাক্স থেকে একটা হাতে-সেলাই 'কিমনে' বের করলে এবং নবাগতের হাতে দিয়ে পঁচিশটি ইয়েন নিলে। ইয়েনগুলি নিয়ে সে পোষাক বদল করে বের হয়ে গেল। গৃহিনী ঘরে এসে দেখলে তার বাক্স খোলা। দেখেই সে চিৎকার করতে লাগল। তারপর এল আমার ঘরে। দেখলে আমি শুয়ে আছি, চুরি ক'রে পালাইনি। তারপব এক লাফে আঙ্গিনায় গিয়ে নিজের স্বামীকেই বোধ হয় গাল দিতে লাগল। কতকগুলি লোক এল, সবাই বললে, "ইলবন সারন", অর্থাৎ জাপানী। আমি বুঝলাম, গৃহস্বামীটি স্ত্রীর অজ্ঞাতে চুরি ক'রে তাঁর 'কিমনে'টি একজন জাপানীর

হাতে বেচে দিয়েছে। গৃহস্থের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন আমি এক পথহীন জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হলাম।

অনেক কোরিয়ানই বলেছিল ভাইডেন থেকে যেন রেলগাড়িতে চ'ড়ে যাই, কারণ পথে গভীর বন পড়বে, পথ খুঁজে পাব না। আমার কাছে নানারকমের ম্যাপ ছিল। প্রত্যেকটা খুলে দেখলাম, পায়ে-হাঁটা পথ আছে বটে, কিন্তু সাইকেলের পথ নেই। দেখলাম পাহাড়গুলির উচ্চতা সাগর থেকে মাত্র দেড় হাজার ফুট। কত পাহাড় পার হয়ে এলাম, আর ঐ ছোট পাহাড়টিকে ভয় করব? শরীরে শক্তি আছে, মনে সাহস আছে, অতএব ঠিক যেতে পারব ভেবে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের পথে এলাম। কোরিয়ানরা এই স্থানটুকু পায়ে হেঁটে যেতেই পছন্দ করে। আমিও তাদের পথ ধ'রে এগিয়ে চললাম। কিন্তু পথটা এত পিচ্ছিল যে বারবারই মনে হতে লাগল যেন প'ড়ে যাব। দুজন জাপানী মজুরও যাচ্ছিল। তারা আমাকে পাহাড়ে চড়তে সাহায্য করল। তাদের সঙ্গে 'ইন্' নামক রেলস্টেশনের কাছে গেলাম। এই পাহাড়টা পার হ'তে দু ঘণ্টা লেগেছিল।

স্টেশনমাস্টার আমার ছবি তুললেন। এই ছবি তোলবার রোগ জাপানীদের মধ্যে যেমন, কোরিয়ানদের মধ্যেও তেমনি। ছবি তোলা হ'লে পর জলযোগ করতে স্টেশনের কাছে একটা কাফেতে গেলাম। চা খেয়ে বিদায় নেব, এমন সময় স্টেশনমাস্টার এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ছবি কোথায় পাঠাবেন। ফুসানে ছবি পাঠাতে ব'লে দিলাম। রওনা হবার সময় দুজন সাদা রাশিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। তারা শিকারী, কিরিন প্রদেশের পার্বত্য ভূমিতে বন্যজন্তু বধ ক'রে তাদের চামড়া কোরিয়াতে বিক্রী করতে আসে, মাঝে মাঝে জাপানে যায় এবং লাল রুশিয়ানদের বিপক্ষে প্রচারকার্য করে। তাদের কথার ভাবেই

আমি তা বুঝেছিলাম। তারা আমাকে বললে, ঐ পথে তিনজন হিন্দুকে দুজন ইউরোপীয় পর্যটকের সঙ্গে যেতে দেখেছে। শুনে কৌতূহল হ'ল। এই পর্যটকদের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পর্যটকদের সঙ্গে এদের কথা হয়নি ব'লে কিছুই বলতে পারলে না।

দুদিন পথে কাটিয়ে টাইকো নামক স্থানে পৌছি। টাইকো বড় শহর বটে, কিন্তু শিউলের মত নয়। দেখার মত এখানেও যথেষ্ট জিনিষ আছে। গৃহশিল্পই একমাত্র দেখার বস্তু নয়। কি ক'রে মানুষ গড়া হয় তাও দেখবার বিষয়। স্কুল ও কলেজগুলিই হ'ল মানুষ গড়ার স্থান। জাপান এখানে মনের মত ক'রে তাদের আপন ছেলে মেয়েদের গ'ড়ে তুলছে। কোরিয়ানরাও গ'ড়ে উঠছে তাদের আপন পথ ধ'রে। টাইকো জাপানের খুবই কাছে, তাই শিক্ষার ধারাটাও এখানে একটু অন্য রকমের। কোরিয়ান এবং জাপানী ছেলেদের বলা হয়, "তোমরা জাপানী। জাপানী তোমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষাই হ'ল তোমার উন্নতির মূল।" আমাদের দেশে যেমন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বলা হয়, হরিনামেই মানবের সকল উন্নতি, কোরিয়ায় কিন্তু তা নয়। তারা সর্বপ্রথম নিজের জাতীয় গান গায় এবং তারপর পাঠ আরম্ভ করে। অনেক স্কুলে জাতীয় গান গাইতে দেওয়া হয় না। স্কুলে যাওয়ামাত্রই প্যারেড করান হয়, তারপর ছেলেমেয়েরা আপন আপন ক্লাসে যায়। কোরিয়ান ছাত্রদের পোষাকেরও পরিবর্তন হয়েছে। জাপানী ধরণে ছেলের দল বুট, পট্টি আর মাথায় স্কুলের নাম-লেখা টুপি প'রে আসে। বিদ্যার্থীরা যখন কুচকাওয়াজ ক'রে পথ চলে তখন মনে হয় যেন একটি কালো সাপ পথ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। অন্য স্কুলের ছেলে বিপরীত দিক থেকে এলে এক দল অন্য দলকে জাপানী পল্টনদের কায়দায় নমস্কার করে।

তারপর চরিত্র গঠনও দেখেছি। বলতে হ'লে অনেক কথা বলতে হয় এ সম্বন্ধে। জার্মানী, তুরস্ক, বুলগেরিয়া এবং ইরাণে যেমন আরব, ইহুদী এবং ইউরোপীয় নাবিকের নৈতিক দোষ ছাত্রদল হ'তে দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছে, জাপানও কোরিয়ান এবং জাপানী ছেলেদেব সেই পাপ-পথ হতে বাঁচাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে এবং সেজন্য প্রত্যেক স্কুলে একজন বরে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে।

তাইডেনে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি একটি বক্তৃতা দিই। বক্তৃতার পর জাপানী শিক্ষক আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বরেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ছাত্র এবং ছাত্রীর যদি চরিত্রদোষ হয় তবে তা সংশোধনের জন্য ভারতে কি ব্যবস্থা আছে। তারপর কোনও ছাত্রের যদি জন্মগত দুর্বলতা থাকে, তবে তাকে সবল করার কোনও ব্যবস্থা আছে কি না। আমি আমার গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়েই পাঠ করেছি। সেখানে ছেলেদের স্বাস্থ্যানুশীলনের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু শহরের ছাত্ররা আমাদের গোঁয়ারগোবিন্দ বলত তা মনে আছে। কলেজের নাম শুনলে তো আমার ভয় হ'ত। যেখানে লোকে বি-এ, এম-এ পড়ে সেখানকার কথা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে স্মরণ করতাম। গ্রাম্য উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই পল্টনী চাকরি করি, তারপর মালয়তে নৌবিভাগে চাকরি নিই, আমি শিক্ষার কি ধার ধারি? জাপানী শিক্ষককে আমি সত্য কথাই বলেছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে খুশী হয়েছিলেন। আমায় দেখাবার জন্য স্কুলে ছেলেদের খালি গায়ে প্যারেড করান হ'ল। শিক্ষক সগৌরবে প্রত্যেক ছেলের বুক ঠুকে দেখাতে লাগলেন, তাদের বুকের পাটা কত শক্ত।

এদের কি ক'রে উন্নত ক'রে বীরপুরুষে পরিণত করা যায় তারই কথা আমাকে বোঝালেন। বললেন, সর্বপ্রথম খাদ্যের দিকে তাদের

বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। তারপর যাতে ছাত্রদের উপর কোনও রূপ মানসিক চাপ না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। সেজন্য ছেলেদের ইচ্ছানুযায়ী বিষয় পাঠ করতে দেওয়া হয়। খেলার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হয়। স্কুলেও তারা যাতে কিছু খেতে পায় তার ব্যবস্থা আছে। বাদাম সিদ্ধ ক'রে চিনি মিশিয়ে নতুবা চালকে বেশী সিদ্ধ ক'রে লবণ মিশিয়ে স্কুলেই খেতে দেওয়া হয়। জিনিসটা বড়ই উপকারী, কারণ শীঘ্র হজম হয়। এইরকম আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। জাপানীরা কোরিয়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যাতে কোরিয়ান যুবক-যুবতী অন্যদিকে খাট হ'লেও শরীর বর্ধনের দিকে খাট না হয়। এই প্রশংসনীয় কার্য দেখে কোরিয়াতে আমি জাপানীদের শত দোষও ভুলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কোরিয়া সম্পর্কে এত কথা যে বলতে পেরেছি, সেজন্য ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয়, তো তারা হলেন আমেরিকান মিশনারীগণ। তাঁরা যে উদ্দেশ্যেই এদেশে এসে থাকুন না কেন, কোরিয়ান এবং জাপানী ছাত্রদের মধ্যে অকাতরে আমেরিকান ভাষা ছড়িয়েছেন। সেজন্য তাঁরা প্রত্যেকে আমেরিকান সরকার হ'তে মাসিক চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত মাইনে পান, আরও পান ঘরভাড়া। কোরিয়ান ও জাপানীরা আমেরিকানদের দৌলতে ইংরেজী না শিখলে তাদের সম্বন্ধে আমি এত কথা জানতেই পারতাম না। আমি যখন কোরিয়ায় গিয়েছিলাম তখন ছিল পাঁচ ইয়েন এক ডলারের সমান। কম লোকই কোরিয়াতে মাসিক দুশ' ইয়েন খরচ করেন। এমন কি, কোরিয়ার যিনি গভর্ণর জেনারেল তাঁর মাসিক খরচেরও খবর নিলে মনে হবে, তিনিও তত খরচ করেন না। লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, বিজলী বাতির মিটার কোরিয়ান এবং জাপানীদের বাড়িতে নেই। জলেরও একই

ব্যবস্থা। মাছ খুব সস্তা। এক পয়সায় ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত স্যামন মাছ মিলে। তরকারিও সস্তা। চাল যা খাওয়া হয় তার দর আমাদের দেশের মতই। দুধ তিন পোয়া পাঁচ পয়সা। এতে খরচ বেশী হবার কথা নয়। ভাং, গাঁজা, আফিম খাওয়া কোরিয়ায় নিষিদ্ধ, অতএব সেদিকেও খরচ করবার উপায় নেই। সিনেমা থিয়েটারেও সাধারণ লোক রবিবারেই বেশী যায়।

টাইকো শহরে এক জাপানীর বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলাম। গৃহস্বামী বৃদ্ধ, তাই ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। দেখে বিস্মিত হলাম তাঁর ধর্মকর্মটা আমাদের দেশের শৈব সন্ন্যাসীদের মত। তিনি শিণ্টো ধর্ম মানেন বললেন। 'শিণ্টো' যে 'শিব' শব্দের অপভ্রংশ তা জাপানে গিয়ে বুঝেছিলাম।

এর পর ফুসানের দিকে রওনা হলাম। টাইকোর পরই যে ভূমিখণ্ড তা বড়ই অনুর্বর এবং দেখতেও বিশ্রী। কিন্তু জাপানী নিয়মে আবাদ করবার ব্যবস্থা হয়েছে ব'লে আমাদের দেশের এক বিঘা জমিতে যে ধান হয়, তার দ্বিগুণ ধান হয় এই অনুর্বর ক্ষেত্রে। কোরিয়ান ও জাপানীরা বরুণদেবের অনুগ্রহ বা আল্লার নেকনজরের প্রতীক্ষায় হাঁ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে থাকে না। তাদের ধানক্ষেতের জন্য জল মজুত থাকে। আমাদের বড় বড় শহরেও জলের পাইপ নেই, কিন্তু কোরিয়ার প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেই জলের পাইপ আছে। জলের দরকার হ'লেই পাইপ ছেড়ে দেয়, জমিও জলে ভর্তি হয়। তারপর সার দিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক প্রকারের সার দেবার পর যাতে জমিতে সারটা মিশে গিয়ে প্রাকৃতিক সারে পরিণত হয়, সেজন্য অপেক্ষা করে। অন্তত চার রকমের সার দেওয়া হয়, তারপর আর একবার জমি চ'ষে বীজ বপন করা হয়। পরে চারা উদ্‌ভিন্ন হ'লে হাড়-মিশ্রিত

একরকম চূর্ণ প্রত্যেক 'গোছা'র নীচে ঢেলে দেয়। কতবার যে এমন করা হয় তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি, তবে মনে হয় একাধিক বার এইরূপ করা হয়। তারপর যখন ধানের গোছাগুলি কালো হয়ে ওঠে তখন কৃষক বই পড়ে, দাবা খেলে, গল্প করে, তার পূর্বে নয়। জাপানের মতই কোরিয়াতে ধান হয় তবুও জাপানীরা স্কুলপাঠ্য বইয়ে লেখেন যে, এখনও কোরিয়ার চালে আঁঠা হয়নি ভাল ক'রে, অতএব কোরিয়ানদের শরীর মজবুত করতে হ'লে জাপানী চালই তাদের খাওয়া দরকার। কোরিয়ায় যত ধান হয় তা প্রায়ই নাগাসাকিতে গিয়ে কলের চাল হয়ে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে চালান যায়। কোরিয়ানরা জাপানের চালই খেতে বাধ্য হয়।

ওদের স্কুলপাঠ্য বই আমি অনেক দেখেছি। জিজ্ঞাসা করে জেনেছি স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই সব বই। বইগুলির দাম খুব কম। অনেক বই আবার বৎসরে দুবার একবার বদলেও যায়। বই-ই হ'ল বলতে গেলে মানুষ গড়ার হাতিয়ার। ওদের ভূগোলও দেখেছি। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, ভারতবর্ষের নাম ওরা ইণ্ডিয়া বলে না, হিন্দুস্থানই বলে থাকে। হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর হিসাবে গৌরীশংকরেরই উল্লেখ আছে, এভারেস্টের নয়। উভয়েরই উচ্চতা কিন্তু সমান ব'লে উল্লিখিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজী ভৌগোলিক নাম তারা ব্যবহার করতে রাজী নয়। হয় প্রাচীন নাম, নয় নিজেদেরই বানানো নাম দিয়ে বসে। এই স্বাধীনতা নিজেদের দেশ সম্বন্ধেও সমান। শিউল-এর জাপানীদের দেওয়া 'কেজো' নাম এখনও ইংরেজরা ব্যবহার করে না, শিউল নামই ব্যবহার করে।

টাইকো এবং আশপাশের স্থান দেখে যখন সমতল ভূমিতে এসে নূতন ধানের মাঠ দেখলাম তখন আমার বেশ আনন্দ হ'ল, কারণ আর

কয়েক দিনের মধ্যেই জাপান যাব। এর চেয়ে বড আনন্দ আর কি হতে পারে? তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে ফুসানেব দিকে চললাম।

বিদায়

অনেকদিন সংবাদপত্র পাঠ করিতে পারিনি, ফুসানে গেলে ইংরেজী সংবাদপত্র পাবার সম্ভাবনা আছে। উৎসাহ শরীরে শক্তি এনে দিল। এই উৎসাহজনিত শক্তির সাহায্যে আমি বিনা কষ্টে ফুসানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু ফুসান লোকপূর্ণ বসতি ব'লে হোটেল, কাফে প্রভৃতিব সংখ্যা যদিও বেশী তথাপি জিনিষপত্র দুমূল্য।

ফুসানে পুলিশের আদেশমত এক জাপানী হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এখানে অনেক বিদেশী আছেন যাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় অনেক তথ্য জানতে লাগলাম। ফুসান war zone ব'লে এখানে ফোটো তোলা, দূরবীণ দিয়ে দেখা—এসব নিষিদ্ধ। আবার বেশী কথাবার্তাতেও অনেক সময় দোষ হয়। আমার এসব মোটেই ভাল লাগল না। পল্টনে কাজ করেছি ব'লেই জাপানীরা আমার চলাফেরা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ছিল। দ্বিতীয় দিনে একজন জাপানী ভদ্রলোক এসে দেখা করলেন, তিনি বেশ ভাল মালয় বলতে পারতেন। তিনি যেন তাঁর হৃদয়ের দ্বার খুলে দিলেন আমার কাছে। আমাকে বললেন, "একটি অস্ট্রিয়ান পর্যটক এসেছে ঘোড়ায় চ'ড়ে। যদি আপনি এসে তার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে সাহায্য করেন তো বড়ই ভাল হয়।" তার অনুরোধের আবরণে আদেশ পালন করতে খুশীর সঙ্গে রাজী হলাম। উভয়ে মিলে অস্ট্রিয়ানের হোটেলে গেলাম। হোটেলটি আমার হোটেলের কাছেই। সামনের দরজা খোলাই ছিল। আমরা জুতো খুলে বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। তারপর খবর

পাঠালাম। ভদ্রলোক প্রথমে ব'লে পাঠালেন, দেখা হবে না। তার-পর সঙ্গের ভদ্রলোকটি যখন নিজের আসল পরিচয়জ্ঞাপক (গোয়েন্দা পুলিশ) কার্ড পাঠালেন তখন তিনি এসে আমাদের দর্শন দিলেন। তাঁকে আমি নমস্কার করলাম। তিনি বললেন, "সেলাম বল।" তাঁকে বললাম, "that is enough। আমরা বাঙ্গালী, আমরা নমস্কারই করি।" এতে তিনি রেগে গিয়ে ভারতবাসীদের জাত ধ'রে গাল দিতে লাগলেন। "আমাকে গাল দেবে দাও, কিন্তু ভারতবাসীদের গাল দেবার তুমি কে হে?" ভয়ানক রাগ হয়ে গেল, বললাম, "মুখ সামলে কথা বলো।" জাপানী ভদ্রলোক মাঝে প'ড়ে দুজনকে থামালেন। অস্ট্রিয়ান পর্যটককে বুঝিয়ে দিলেন, এমনভাবে কথা বলাই তাঁর অন্যায় হয়েছে। জাপানীদের বাপ মা তুলে গাল দিলে তারা তেমন দোষ নেয় না, কিন্তু জাত তুলে বা দেশ তুলে গাল দিলে আর রক্ষা নেই। এমন কি অনেক সময় রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়।

জাপানী গোয়েন্দা এবং আমি হোটেলে ফিরে এলাম। তিনি আমার কাছে ফের ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "যদি আপনাকে না নিয়ে যেতাম তো এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ঘটত না।" তবু মন অনেকটা হালকা হ'ল। সারাটা দিন কিছু ভাল লাগল না। কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না ক'রে সিমনোসেকির একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে পরদিন যাবার জন্য তৈরী হলাম। প্রাতে উঠে শহরটা আবার পর্যটন ক'রে বেলা নয়টার সময় গিয়ে জাহাজে উঠলাম।

বেশ পরিষ্কার দিন, বাতাস মোটেই নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, তাই একটু আদরও ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কয়েকজন চীনা এবং কয়েকজন রাশিয়ান ছিল। তাদের সঙ্গে ইচ্ছা ক'রেই কথা বলিনি, কি জানি কি হয়। জাহাজখানা বেশ ভাল ক'রে দেখে নিলাম।

বেড়াতে বেড়াতে দৃষ্টি গেল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর। ফুসান থেকে সিমনোসেকির দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দশ ইয়েন, তৃতীয় শ্রেণীর পাঁচ ইয়েন। পাঁচে আর দশে দ্বিগুণ প্রভেদ বটে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীটার একটু রকম বলি। প্রত্যেক যাত্রীর শোবার একখানা ক'রে খাট আছে। আপন আপন বিছানা বিছিয়ে অনেকটা ইজিচেয়ারের মত করে ব'সে সংবাদপত্রও পড়তে পারা যায়। প্রত্যেক যাত্রীকে এক-জোড়া ক'রে ঘাসের চটি জুতো পরতে দেওয়া হয়, তিন বার খাবার দেওয়া হয়। আহারের জন্য আলাদা ঘর আছে, তাতে প্রত্যেক বারে পঞ্চাশ জন ব'সে খেতে পারে। জাপানী নিয়মে উত্তম খাদ্য দেওয়া হয়। চায়ের জন্য পয়সা লাগে না। সাগর যদি অশান্ত থাকে তবে কেউ চা খায় না, শান্ত থাকলে অনেকেই দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার চা খায়। দেখলাম জাহাজ কোম্পানী খুব উদার। জাপানী নিয়মে স্নানের বেশ ভাল বন্দোবস্ত আছে। আমি তো দিনে দুবার স্নান করেছিলাম। জাহাজের খালাসীগুলি এত উদার এবং এত ভদ্র যে, সময় হ'ক অসময় হ'ক তাদের কাছে কিছুর জন্য গেলে তারা তৎক্ষণাৎ 'ষ্টোর কীপার'-এর কাছে নিয়ে যায়। 'ষ্টোর কীপার' যদি না বোঝে তবে কাপ্তেন স্বয়ং এসে বুঝিয়ে দিয়ে যান, আবার সঙ্গে সঙ্গে 'থ্যাংস'ও বলেন। এই এক স্টীমার লাইন, আর আমাদের দেশের চাঁদপুর-গোয়ালন্দেরও এক স্টীমার লাইন।

এত ভাল ব্যবহার পাচ্ছিলাম বটে কিন্তু কি জানি কেন নিতান্তই যেন নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছিল। কত সামুদ্রিক দৃশ্য দেখছিলাম, কত রকমে মন ভোলাতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কিছুতেই অন্যমনস্ক হ'তে পারছিলাম না। ডেকের উপর পায়চারি করছি, এমন সময় একটি জাপানী ছোকরা এসে বললে, "আপনি কি চীন থেকে এসেছেন?"

বললাম, "হাঁ, আমি চীন ও কোরিয়া ভ্রমণ ক'রে এখন জাপানে যাচ্ছি।"

"মাঞ্চুকো কেমন দেখলেন ?'

বললাম, "ভালই।"

ছেলেটি বলল, "এবার আমেরিকার 'মনরো ডকট্রিন'-এর পাল্টা জবাব দেবার সময় হয়েছে।"

আমি বললাম, "ওকে কি তার পাল্টা জবাব বলে ? যদি মাঞ্চুকোকে জাপানের মত স্বাধীন ক'রে দেওয়া হ'ত তবেই 'মনরো ডকট্রিন'-এর পাল্টা জবাব হ'ত।"

যুবকের মুখ লাল হয়ে গেল এবং আমাকে বলল, "আপনি কিছুই বোঝেননি, আপনার বোঝবার ক্ষমতাও নেই, আপনার ভ্রমণ নিরর্থক।"

এই ব'লেই ছেলেটি চ'লে গেল। আমি ঝগড়া বাধাতে চাইনি। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলাম ভুল করেছি। খানিক পরে লক্ষ্য করলাম উপর হ'তে নীচে পর্যন্ত সকলেরই দৃষ্টি আমার প্রতি রোষকষায়িত। যাই হ'ক এবিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি ক্যাবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ কে দরজার কড়া নাড়ল। দরজা খুলতেই একজন চীনা এসে আমাকে তাড়াতাড়ি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, "আপনার কথায় ওদের বেশ ঘা লেগেছে, সিমনোসেকিতে আপনার বিড়ম্বনা হবে। আমি মাঞ্চুকোর লোক।"—ব'লেই লোকটি নিমিষে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল।

রাত্রি সাতটার সময় জাহাজ সিমনোসেকিতে এল। আমি চিন্তিত মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
